Dhaka University Institutional Repository

# বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’ কাব্যে ইতিহাস ও সমাজচিত্র

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল.ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

**গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক**
নিরঞ্জন অধিকারী
অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত)
সংস্কৃত বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

**গবেষক**
সোমা দে
পরীক্ষার রোল নং-০২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম.ফিল.
নিবন্ধন নং-৬৮
শিক্ষাবর্ষ ২০১৩-২০১৪

**সংস্কৃত বিভাগ**
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

**জানুয়ারি ২০২২**

Dhaka University Institutional Repository

# সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং-

১। প্রত্যয়নপত্র..... ২

২। ঘোষণাপত্র..... ৩

৩। কৃতজ্ঞতাস্বীকার..... ৪

৪। প্রারম্ভিক..... ৫-৯

৫। প্রথম অধ্যায়..... ১০-১৯

৬। দ্বিতীয় অধ্যায়..... ২০-২৪

৭। তৃতীয় অধ্যায়..... ২৫-৫৪

৮। চতুর্থ অধ্যায়..... ৫৫-৬০

৯। পঞ্চম অধ্যায়..... ৬১-৭১

১০। ষষ্ঠ অধ্যায়..... ৭২-৭৪

পরিশিষ্ট

১। টীকা ও তথ্যনির্দেশ

২। গ্রন্থপঞ্জি..... ৭৫-৮১

৩। গবেষণা কর্মের সাথে সম্পর্কিত প্রাচীন যুগের মানচিত্র... ৮২-৮৪

৪। হর্ষের নিজ হাতে লেখা নামাঙ্কিত প্লেট..... ৮৫

৫। প্রাচীন যুগে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন..... ৮৬-৯৩

Dhaka University Institutional Repository

# প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **'সোমা দে'** কর্তৃক উপস্থাপিত **বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' কাব্যে ইতিহাস ও সমাজচিত্র** -শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত। তিনি এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপন করেননি।

০৯. ০২. ২০২২

**অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী (অবসরপ্রাপ্ত)**

সংস্কৃত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০।

ও

**গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক**

তত্ত্বাবধায়ক
এম, ফিল/পিএইচডি কোর্স
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

# ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণার ফসল। এও প্রত্যয়ন করছি যে, এ অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে এম.ফিল. পি এইচ.ডি. বা অন্য কোনো উচ্চতর ডিগ্রির জন্য জমা দেওয়া হয়নি।

অত্র অভিসন্দর্ভে যে সব গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে তার উল্লেখ তথ্যনির্দেশিকায় রয়েছে।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
নিরঞ্জন অধিকারী
অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত)
সংস্কৃত বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০।

গবেষক
সোমা দে
পরীক্ষার রোল নং-০২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম.ফিল.
নিবন্ধন নং-৬৮
শিক্ষাবর্ষ ২০১৩-১৪

Dhaka University Institutional Repository

# কৃতজ্ঞতাস্বীকার

## সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি

অনেক কষ্ট আর শ্রম স্বীকার করে বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' কাব্যে ইতিহাস ও সমাজচিত্র নামক গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। তবে এই আনন্দের পিছনে অনেকের অবদান রয়েছে।

আমার গবেষণা কর্মের পিছনে যার অবদান সবথেকে বেশি, তিনি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী। আজকের এই আনন্দের দিনে তাঁর প্রতি রইল শতকোটি প্রণাম। এ গবেষণা পত্রটির জন্য তিনি যে শ্রম দিয়েছেন ও বিভিন্ন ধরনের উপদেশ নির্দেশনা প্রদান করে যেভাবে আমার গবেষণা কর্মটিকে সফল করতে সহায়তা করেছেন তাঁর জন্য আজীবন তাঁকে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করব।

আরও স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব ভানুলাল দেকে ও আমার মাতা সীমা রানী দত্তকে এবং স্নেহাস্পদ ছোট বোন অন্তরা দেকে যাদের অনুপ্রেরণার ফসল আমার এ গবেষণা কর্ম।

অধ্যাপক ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস, অধ্যাপক ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক, অধ্যাপক ড. মাধবী রানী চন্দ, অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, অধ্যাপক ড. মালবিকা বিশ্বাস সহ সকল শিক্ষকদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কারণ এঁরা প্রত্যেকে আমাকে এ গবেষণা কর্ম করার জন্য প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা যুগিয়ে গেছেন। এছাড়াও সংস্কৃত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কালিদাস ভক্তের প্রতিও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, তিনিও আমাকে বড় ভাইয়ের মতো আদেশ উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এছাড়া সংস্কৃত বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গবেষণা কাজে মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, সংস্কৃত বিভাগের সেমিনার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এজন্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কম্পিউটার পরিচালনায় ছিলেন, আমার ছোটভাই সমতুল্য মোঃ রিয়াদ হোসেন, যিনি আমাকে গবেষণা পত্রের কম্পোজ পরিচালনা করে এবং গবেষণা পত্রের প্রুফ সংশোধনের সহায়তা করে আমার এ কাজকে অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছেন।

আমার গবেষণাপত্রটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যে সকল পুস্তক ও জার্নালের সহায়তা নিতে হয়েছে সে সব পুস্তক ও জার্নালের লেখকদেরও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

এছাড়াও যে সকল শুভাকাঙ্ক্ষী এ গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদেরকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বিনয়াবত<br>
সোমা দে<br>
এম.ফিল. গবেষক<br>
সংস্কৃত বিভাগ<br>
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়<br>
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

# প্রারম্ভিক

‘শক্তিতে যিনি ইন্দ্র’
শান্তিতে যিনি অশোক,
মেঘের মতো নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে
বর্ষিত হয় যাঁর দান
বিদ্যা যার মানস তরুর সুরভিত পুষ্প’
বন্ধু যাঁর- বৈদগ্ধ্য,
সভাসদ যার শুভবুদ্ধি-’[১]

তিনিই হলেন সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট। তাঁর অনবদ্য দুটি রচনা হলো ‘হর্ষচরিত’ ও ‘কাদম্বরী’। ‘হর্ষচরিত’ আগে লেখা, ‘কাদম্বরী’ পরে ‘লেখা’। এ বিষয়ে কীথের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য:

‘It is by no means clear which of the two words really was written first, though there is a good deal to be said for the priority of the Harsacarit’[২]

গদ্যকাব্যের দুটি প্রধান শ্রেণি হলো ‘কথা’ ও ‘আখ্যায়িকা’।
‘কথা’ কবির স্বকপোলকল্পিত, আর ‘আখ্যায়িকা’ মূলত তথ্যভিত্তিক। সাহিত্যদর্পণে ‘আখ্যায়িকা’র লক্ষণে বলা হয়েছে যে,

আখ্যায়িকা কথাবৎ স্যাৎ কবের্বংশানুকীর্তনম্।
অসামান্যকবিনাং চ বৃত্তং পাদ্যং ক্বচিৎ ক্বচিৎ।।
কথাংশানাং ব্যবচ্ছেদ আশ্বাস ইতি বধ্যতে।
আর্যাপবক্ত্রাপবক্ত্রানাং ছন্দসা যেন কেনচিৎ।।
অন্যাপদেশেনশ্বাসমুখে ভাব্যর্থ-সূচনম্ ।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ কথার মতোই। এতে কবির নিজ বংশ বর্ণিত হবে, নিজের ও অন্য কবিদের কথাও থাকবে, মাঝে মাঝে পদ্য থাকবে। আখ্যায়িকার বক্তা নায়ক নিজে। আখ্যায়িকার বিভাগগুলোর নাম হবে আশ্বাস বা উচ্ছ্বাস। প্রতিটি উচ্ছ্বাসের শুরুতে যে কবিতা থাকবে তাতে থাকবে ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত। আখ্যায়িকার সকল লক্ষণই আমরা 'হর্ষচরিতে'র মধ্যে দেখতে পাই।[৪]

প্রথমত : এর বিষয় ঐতিহাসিক (অর্থাৎ তথ্যভিত্তিক)

দ্বিতীয়ত : প্রথম আড়াই উচ্ছ্বাসে বাণ আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

তৃতীয়ত : শুরুতেই কিছু শ্লোকে ব্যাস, সুবন্ধু, ভট্টার হরিশ্চন্দ্র, সাতবাহন, ভাস প্রমুখ প্রাচীন কবিদের রচনার স্তুতি আছে।

চতুর্থত : বক্তা স্বয়ং বাণভট্ট।

পঞ্চমত : বিভাগগুলোর নাম উচ্ছ্বাস।

ষষ্ঠত : মাঝে মাঝে পদ্য আছে।

সপ্তমত : উচ্ছ্বাসের শুরুতে ভাবী ঘটনার ইঙ্গিতবাহী শ্লোক আছে।

অগ্নিপুরাণের কাব্যশাস্ত্র বিভাগেও গদ্যকাব্যের কয়েকটি বিভাগের উল্লেখ থাকলেও (খণ্ডকথা, পরিকথা, কথানিকা ইত্যাদি) আখ্যায়িকার যেসব লক্ষণ সেখানে নির্দেশিত, তার সাথে সাহিত্যদর্পণাদিতে উল্লিখিত লক্ষণের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।

বাণের 'হর্ষচরিতে'র একটিমাত্র টীকা পাওয়া যায় যা শংকর কর্তৃক রচিত। শংকরের টীকাটি খুবই সংক্ষিপ্ত হলেও দুরূহ বা অপ্রচলিত শব্দের উদ্‌ঘাটনে এ টীকার ভূমিকা ছিল অনবদ্য। টীকার শেষে তিনি বলেছেন যে,

দুর্বোধে-'হর্ষচরি'তে সম্প্রদায়ানুরোধতঃ।
গূঢ়ার্থোনমুদ্রনাং চক্রে শঙ্করো বিদুষং কৃতে ॥[৫]

(অর্থাৎ দুর্বোধ্য 'হর্ষচরিতে' বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর অনুরোধে শঙ্কর বিদ্বজ্জনের জন্যে গূঢ়ার্থ উন্মোচন করলেন)। বিদ্যাসাগরও হর্ষচরিতের দুর্বোধ্যতার কথা বলেছেন।

বাণভট্টের রচনাশৈলীর মাধুর্য অনবদ্য। ভারতবর্ষের সাহিত্যে দুটি প্রসিদ্ধ চরিত বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমটি অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' -ভারতে এবং বহির্জগতে যেটি বৌদ্ধিক বেদ, আর দ্বিতীয়টি হলো বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'।`Hillebrandz, Roth, Zimmer, Ludwing, Geldner প্রমুখ বিদেশী সাহিত্যিকগণ তাদের বিভিন্ন লেখায় বাণভট্টের প্রশস্তি গেয়েছেন।[৬]

সপ্তম শতাব্দীর এই 'হর্ষচরিতে' বাণভট্ট তৎকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক শ্রী, প্রাদেশিক আচার, বন-গ্রামিক কৌলিন্য, দেশাত্মবোধ ও নির্ভীকতা, রাষ্ট্রীয় প্রীতি, সামরিক দণ্ডযাত্রা এবং সাধারণ জীবনযাত্রার একটি সম্পূর্ণ চিত্র অত্যন্ত নিপুণতার সাথে অঙ্কন করেছেন, যা এককথায় বলতে গেলে অতুলনীয়।

'বশ্য-বাণী-কবি চক্রবর্তী'[৭] শ্রীবাণভট্টের সম্রাটপ্রদত্ত উপাধি। সেইস্থলে শ্রীহর্ষবর্ধনের উপাধি ছিল 'পরম মহেশ্বর রাজচক্রবর্তী'। এই দুটি উপাধি থেকেই বুঝতে পারা যায় তৎকালীন সমাজের স্থিতিশীলতার কথা।

বাণসম্পর্কে আমরা জানতে পারি যে, তিনি ছিলেন বাৎস্যগোত্রীয় চিত্রভানু ও রাজদেবীর পুত্র। শৈশবেই মাতৃহীন হন। তার পিতাই ছিলেন একাধারে পিতা ও মাতা। সেই পিতাকেও যৌবনের মুখে হারালে ঘরের বাঁধন তার কাছে শিথিল হয়ে যায়। বাউণ্ডুলে জীবন-যাপন করতে থাকেন। বিচিত্র বৃত্তির সঙ্গীদের সাথে দেশে বিদেশে ঘুরে লাভ করেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পরবর্তীতে হর্ষের ভাই কৃষ্ণের কাছ থেকে আহ্বান এলে ইতি টানলেন, তার অতীত বাউণ্ডুলে জীবনের । গার্হস্থ্য জীবনের সুখশান্তির পথে এবার তরী ভিড়ালেন। বাণ নানাদিক বিবেচনাকরে রাজদর্শনে যাওয়াকেই বিবেচ্য বলে মানলেন। কিন্তু রাজা হর্ষ যখন বাণকে কটাক্ষ করে 'মহানয়ংভুজঙ্গ' বলে সম্বোধন করলেন। তৎক্ষণাৎই তার প্রত্যুত্তর করতে তিনি ছাড়লেন না বললেন, 'কা মে ভুজঙ্গতা'?[৮]

তিনি রাজা হর্ষকে উদ্দেশ করে বললেন, আপনি পরের কথায় কান দিয়ে ভ্রান্তধারণা পোষণ করছেন। আমি প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশজাত, যথাকালে আমার উপনয়নাদি সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। সাঙ্গ বেদ আমার অধীত, বহু শাস্ত্র আমি শ্রবণ করেছি। দারপরিগ্রহ করে গার্হস্থ্যধর্ম পালন করছি। আমার উচ্ছৃঙ্খলতা কোথায় দেখলেন? ছেলেবেলার চাপল্যটাই বড়ো হলো, আর এ সবই মিথ্যে, বোঝা গেল বাণের নৈতিক ক্রোধ রাজ্য সঙ্গত বলেই মনে করেছেন। রাজা হর্ষ তৎক্ষণাৎই প্রত্যুত্তর করলেন 'এবামস্মাভিঃ শ্রুতম্'। কারণ পাকা জহুরী কখনই রত্ন চিনতে ভুল করেন না। আর তাই বাণভট্ট সমাদৃত হয়েছিলেন রাজকুলে। তিনি হয়েছিলেন হর্ষের সভাকবি।

Dhaka University Institutional Repository

তাইতো তিনি অত্যন্ত কাছ থেকে সবকিছু প্রত্যক্ষ করেছেন, যা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এক নিপুণ শিল্পীর মতোই তার অনবদ্য সৃষ্টিকর্ম 'হর্ষচরিতে'। সংস্কৃত সাহিত্যে 'হর্ষচরিতে'র মতো খুব কম সাহিত্য কর্মই রয়েছে যেখানে কবি এত নিপুণভাবে তার প্রত্যক্ষ ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন। আর এ কারণেই আমি আমার গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'কে নির্বাচিত করেছি। আমার গবেষণাপত্রের অভিসন্দর্ভটি ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে কবি পরিচিতি, 'হর্ষচরিতে'র পরিচিতি ও উচ্ছ্বাস অনুসারে আটটি উচ্ছ্বাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে, সংস্কৃত ঐতিহাসিক কাব্যসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে, 'হর্ষচরিতে'র প্রাক্কাল (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক) ও এর সমসাময়িক কালের ইতিহাসের উপাদান ও তৎকালীন সামাজিক অবস্থা।

চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে 'হর্ষচরিতে' বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনা ও 'হর্ষচরিতে'র ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণ।

পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে 'হর্ষচরিতে' প্রতিফলিত তৎকালীন সমাজের বর্ণনা যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে তৎকালীন সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সংস্কৃতির গুরুত্ব।

সর্বশেষে ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষণাকৃত বিষয়ের পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে যেখানে সার্বিক গবেষণাকর্মের আলোচ্য বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার এবং গবেষকের নিজস্ব মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

# প্রারম্ভিক

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. *'হর্ষচরিত'* বাণভট্ট*:*, প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, প্রথম সংস্করণ: আষাঢ়- ১৩৮৫, জুলাই- ১৯৭৮, দ্বিতীয় সংস্করণ: আষাঢ়- ১৩৯৩, জুলাই- ১৯৮৬, প্রকাশক ডি মেহরা, রূপা এ্যান্ড কোম্পানি, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০৭৩, পৃ. ১

২. *A History of Sanskrit Literature, Classical Period,* A. Berriedale Keith, Published by Oriental Books Corporation, New-Delhi, First Edition: 1923, P. 344

৩. *সাহিত্যদর্পণ:* বিশ্বনাথ কবিরাজ, বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনা, অধ্যাপক শ্রী বিমলাকান্ত মুখোপ্যাধ্যায় ও শ্রী শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা, ৭০০০৬, পৃ. ৬/৩৩৪-৩৩৬

৪. প্রাগুক্ত, ঐ পৃ. ৩৩৬

৫. *'হর্ষচরিত'* বাণভট্ট*:* (১৮শ খণ্ড), সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, প্রধান উপদেষ্টা: ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রকাশক: নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ: ২২ জুন ১৯৮৭, পৃ. ১১

৬. *'হর্ষচরিত'* বাণভট্ট*:* প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, প্রথম সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৮৫, জুলাই ১৯৭৮, দ্বিতীয় সংস্করণ: আষাঢ়, ১৯৯৩, জুলাই ১৯৮৬, প্রকাশক: ড. মেহরা, রূপা এ্যান্ড কোম্পানি, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০৭৩, পৃ. ২-৩

৭. প্রাগুক্ত, ঐ পৃ. ৭

৮. প্রাগুক্ত, ঐ পৃ. ৮-১০

Dhaka University Institutional Repository

# প্রথম অধ্যায়

**ভূমিকা: প্রথম অধ্যায়কে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়েছে-**

(১) কবি পরিচিতি

(২) হর্ষচরিতের পরিচিতি

(৩) হর্ষচরিতের উচ্ছ্বাসভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

## কবি পরিচিতি

বাৎস্যগোত্রীয় চিত্রভানু ও রাজদেবীর পুত্র বাণ। তিনি 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' নামক দুটি গদ্যকাব্য রচনা করেছিলেন। প্রথমটি 'আখ্যায়িকা' আর দ্বিতীয়টি 'কথা'। 'হর্ষচরিত' হর্ষের চরিতকথা হলেও প্রথম দিকে প্রায় আড়াই উচ্ছ্বাসে বাণ নিজের কথা বলেছেন। এতে বাণের চরিত্র সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হয়। অতি বাল্যকালেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয় এবং মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি পিতাকেও হারান। পিতার মৃত্যুর পর বালক বাণ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীদের সাথে মেলামেশা করতে থাকেন। বহু দিন বিদেশ ভ্রমণ করে তিনি গৃহে ফিরে আসেন। একদিন হর্ষবর্ধনের রাজসভায় তার ডাক পড়ে। হর্ষের ভ্রাতা কৃষ্ণের সহায়তায় তিনি রাজসভায় সাদরে গৃহীত হন এবং শীঘ্রই রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন।

'হর্ষচরিতে' বাণ মহারাজ হর্ষের যেটুকু ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, তার সাথে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং লিখিত রাজা হর্ষবর্ধন শীলাদিত্যের বিবরণের তুলনা করলে মনে হয় কনৌজেশ্বর হর্ষবর্ধন শীলাদিত্যই (৬১০-৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন বাণের পৃষ্ঠপোষক। অনুমান করা হয় যে, হর্ষের রাজত্বকালের প্রথম ভাগে বাণ হর্ষের সংস্পর্শে আসেন এবং তখন বাণের বয়স খুব কম। ৬২০ খ্রিষ্টাব্দকে যারা বাণের আবির্ভাবকাল বলে মনে করেছেন তাঁরা সকলেই ঐরূপ অনুমান করেছেন। ভ্রাতৃঘাতীর উপর প্রতিশোধ নেবার পর হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে মনস্থ করেছিলেন, একথা বাণ বলে গিয়েছেন। সুতরাং মনে হয়, হর্ষের রাজত্বের প্রথম ভাগে বাণ তাঁহার সংস্পর্শে আসলেও হর্ষচরিত যখন তিনি রচনা করেন তখন হর্ষের রাজত্বের শেষ ভাগ। আমরা জানি ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে হর্ষের রাজত্বের শেষ হয়েছিল। কাজেই ঐ সময়ের অল্প পূর্বেই বাণ 'হর্ষচরিত' রচনা করেছিলেন।[১]

Dhaka University Institutional Repository

## ‘হর্ষচরিতে’ বাণ-বংশলতিকা[২]

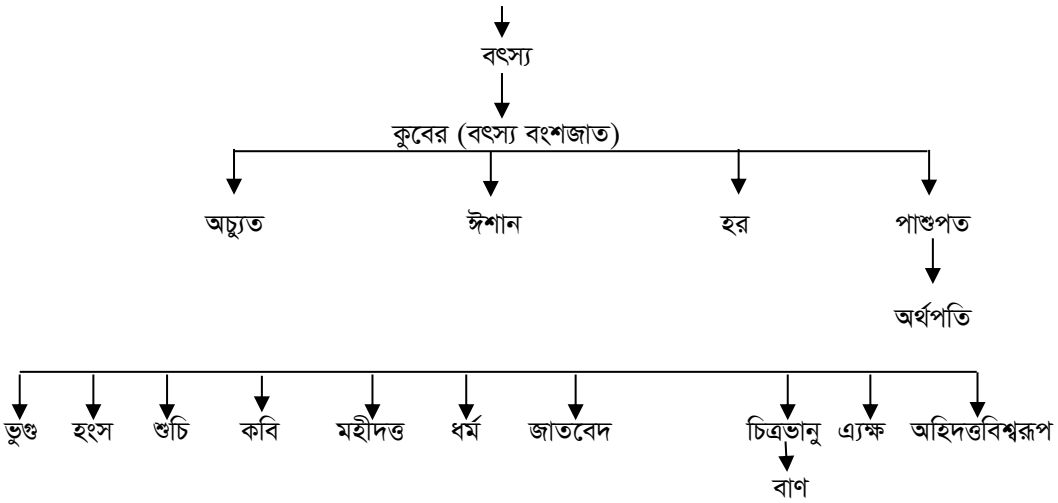


## কাদম্বরীতে বাণ বংশাবলি[৩]

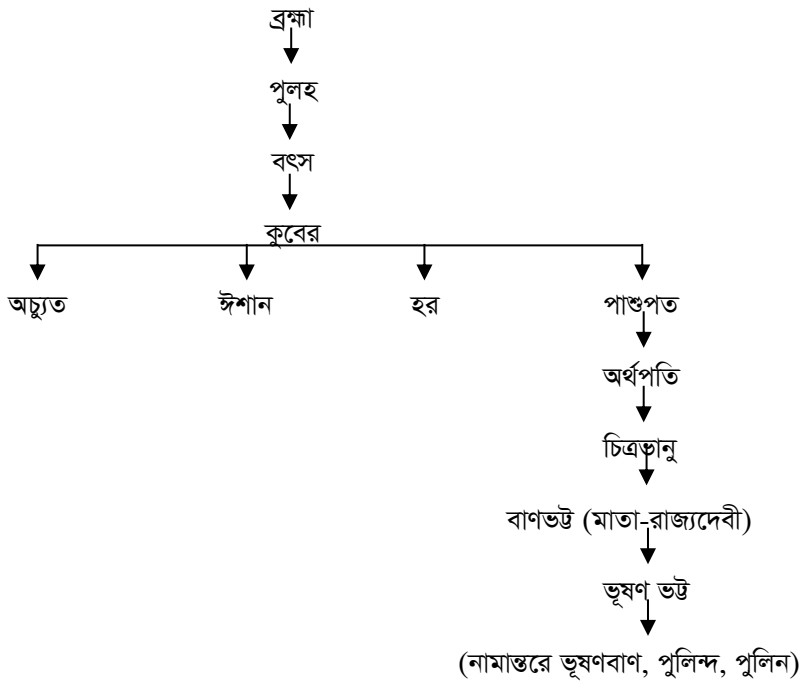

Dhaka University Institutional Repository

# ‘হর্ষচরিতে’র পরিচিতি

বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত ‘আখ্যায়িকা’ শ্রেণির একটি গদ্যকাব্য। গ্রন্থের নামকরণ দেখে মনে হয় যে, বাণ তাঁর পৃষ্ঠপোষক মহারাজ হর্ষবর্ধনের জীবনী রচনা করতে চেয়েছিলেন। বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’ আটটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত। প্রথম আড়াই উচ্ছ্বাসে বাণ আত্মচরিত লিপিবদ্ধ করেছেন। তারপর আরম্ভ হয়েছে হর্ষবর্ধনের কথা। স্থানীশ্বরের রাজা পুষ্পভূতি, তাঁর বংশে মহাপ্রতাপশালী রাজা প্রভাকরবর্ধন। তাঁর দুই পুত্র রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন ও এক কন্যা রাজ্যশ্রী, মৌখরীরাজ গ্রহবর্মার সাথে রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়।

প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্যবর্ধন সিংহাসন গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু হর্ষকে অভিষিক্ত করার পূর্বেই মালবরাজ কর্তৃক গ্রহবর্মার নিধন এবং রাজ্যশ্রীর অপহরণের সংবাদ আসে। রাজ্যবর্ধন মালবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু গৌররাজের বিশ্বাসঘাতকায় নিহত হন। প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জন্য হর্ষবর্ধনও যুদ্ধ যাত্রা করলেন, কিন্তু পথে শুনলেন যে রাজ্যশ্রী মালবরাজের কারাগার হতে পলায়ন করে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন, তখন এক বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁর উদ্ধার সাধন করেন। হর্ষ ও রাজ্যশ্রীর মিলন দেখিয়ে এইখানেই আখ্যায়িকা শেষ হয়েছে এবং মনে হয় হঠাৎ শেষ হয়েছে। মোট ১২০৯ শ্লোকে রচিত এই কাব্য। খ্রিষ্টাব্দ ৮ম শতকের প্রথম ভাগে এই কাব্য রচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

# উচ্ছ্বাসসমূহের বর্ণনা

## প্রথম উচ্ছ্বাস

প্রথমেই কবি হরপার্বতী ও ব্যাসকে প্রণাম জানালেন, তারপর পূর্বসূরিদের গুণবর্ণনা করে ‘হর্ষচরিত’ রচনায় তাঁর দ্বিধাসংকোচের কথা জানালেন। এখানে কবি নিজেই বলেছেন যে, অল্প বুদ্ধি নিয়ে অমন মহাজীবনের বিবরণ দিতে যাওয়া জিহ্বাচাপল্য ছাড়া কিছুই নয়। এর মাধ্যমেই শুরু হলো ‘আখ্যায়িকা’।

ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে বিদ্যাগোষ্ঠীর আয়োজন চলছে। সামবেদের মন্ত্র পড়বার সময় হঠাৎ এক জায়গায় দুর্বাসার স্বরভঙ্গ হলে সরস্বতী হেসে ফেললেন। আর তখনই সরস্বতীকে দুর্বাসা সক্রোধে শাপ প্রদান করলেন যে, ‘দুর্বিনীতে মর্ত্যলোকে চলে যা’ শেষে ব্রহ্মা সরস্বতীকে শাপগ্রস্ত দেখে গাত্রোত্থান করলেন। শেষে তিনি বললেন যে, পুত্র জন্মের পর আবার ফিরে আসা সম্ভব হবে সরস্বতীর। সখী সাবিত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সরস্বতী মর্ত্যলোকে শোননদের তীরে পর্ণকুটির বেঁধে বাস করতে লাগলেন। একদিন চ্যবনমুনির পুত্র দধীচ মাতুলালয় থেকে পিতৃগৃহে আসছিলেন তখন সরস্বতী তাঁকে দেখে মুগ্ধ হলেন আর দধীচও মদনাতুর হয়েছিলেন সরস্বতীকে দেখে। দধীচের সঙ্গে মিলনে সরস্বতীর পুত্র হল। সরস্বতী ব্রহ্মলোকে ফিরে গেলেন। দধীচ তাঁর পুত্র সারস্বতের ভার ভ্রাতৃবধূ অক্ষমালার উপরে সমর্পণ করে বানপ্রস্থে গেলেন। অক্ষমালারও একটি পুত্র জন্মেছিল। তার নাম বৎস। অক্ষমালা দুজনকেই পালন করতে লাগলেন।

বড় হয়ে সারস্বত মায়ের কাছ থেকে পাওয়া বেদ-বিদ্যা ভাই বৎসকে সমর্পণ করে তাকে প্রীতিকুট নামক একটি স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। এই বৎসই বাৎসায়ন বংশের প্রবর্তক। এই বংশেই বাণের জন্ম। অতি শৈশবেই বাণ মাতৃহীন হন। পিতার স্নেহেই সে পালিত হতে থাকে। কৈশোরে পিতৃবিয়োগের পর বাণ নানা বৃত্তির মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে দেশে ফিরে আসেন। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা তাঁকে পেয়ে আনন্দিত হয় আর বাল্যবন্ধুর মধ্যে থেকে তিনি যেন মোক্ষসুখ অনুভব করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

## দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

একদিন গ্রীষ্মকালে হর্ষবর্ধনের খুড়তুতো ভাই কৃষ্ণবর্ধন মেঘলক নামে এক দূতকে বাণের কাছে পাঠালেন এরূপ একটি পত্র দিয়ে যে, সেখানে বাণভট্টকে উদ্দেশ করে লেখা ছিল তোমার গুণ ও বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে আমার কোনো সংশয় নেই, কিন্তু কিছু লোক তোমার বিরুদ্ধে সম্রাট হর্ষের কান ভারী করছে। আমি তাদের বুঝেয়েছি অল্পবয়সে অমন একটু আধটু উচ্ছৃঙ্খল সকলেই হয়ে থাকে। আমার কথা তিনি মেনে নিয়েছেন। আর এ জন্যই কোনো সংকোচ না করে তোমাকে রাজদরবারে চলে আসার জন্য বলছি।

এরপরে দেখা যায় যে, অনেক চিন্তাভাবনার অবসান ঘটিয়ে বাণ শেষপর্যন্ত রাজদরবারে এলেন। রাজা তাঁকে দেখে মন্তব্য করলেন; 'এই সেই মহাভুজঙ্গ'। তৎক্ষণাৎ বাণ প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, ঐ শব্দটি আমাকে উদ্দেশ করে ব্যবহার করা ঠিক হবে না। কারণ আমি শাস্ত্রবিদ কুলীন ব্রাহ্মণ। বাণ আরও বললেন যে, ছেলেবেলায় কী করেছি সেটিই বড় হলো? তখন রাজা হর্ষবর্ধন বললেন যে, আমি এমনটাই শুনেছি। অতঃপর অল্প দিনেই সম্রাট তার উপর প্রসন্ন হয়ে তাঁর প্রসাদজনিত সম্মান, প্রীতি, বিশ্বাস, ধনসম্পদ ও প্রভাবের শীর্ষে তাঁকে স্থাপন করলেন।

## তৃতীয় উচ্ছ্বাস

তৃতীয় উচ্ছ্বাসের শুরুতে লক্ষণীয় যে, বাণ রাজা হর্ষের কাছ থেকে প্রভূত সম্মান পাওয়ার পর রাজদরবার থেকে ফিরে এলে তাঁর জ্ঞাতিবর্গ ও বন্ধু-বান্ধবেরা পরিতুষ্ট হয়ে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। সকলে তাঁর কাছে 'হর্ষচরিত' শুনবার অনুরোধ করলেন। বাণ তখন বললেন যে, সম্পূর্ণ চরিত শোনাবার ক্ষমতা আমার নেই, তবে সেই অবদাত চরিত্রের অংশমাত্র শোনাচ্ছি, এই কথা বলে বাণ শুরু করলেন।

শ্রীখণ্ড দেশে স্থানীশ্বর নামে একটি প্রদেশ আছে। সেখানে পুষ্পভূতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শিবভক্ত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের এক শৈব সাধকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রাজাকে অট্টহাস নামে এক অদ্ভুত তরবারি উপহার দিয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

পুষ্পভূতি ঐ শৈব সাধককে তাঁর সাধনকর্মে সাহায্য করতে গিয়ে দেখলেন যে, পৃথিবী বিদীর্ণ করে এক দৈত্যাকৃতি পুরুষ ঐ সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে এগিয়ে আসছে। রাজা বাহুযুদ্ধে তাঁকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করলেন, দেখলেন তাঁর সম্মুখে স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী বিরাজিতা।

লক্ষ্মী দেবী বললেন, রাজন, তোমার শৌর্যে আমি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি এক চক্রবর্তী রাজবংশের প্রবর্তক হবে। এই বংশে হর্ষ নামে এক চক্রবর্তী রাজা জন্ম নেবেন। এই বলে লক্ষ্মী দেবী অন্তর্হিত হলেন।

## চতুর্থ উচ্ছ্বাস

চতুর্থ উচ্ছ্বাসের শুরুতে দেখা যায় যে, প্রভাকরবর্ধন নামে এক রাজা হুন ও গুর্জর রাজাদের পরাজিত করে সিন্ধুদেশ, গান্ধার, লাট এবং মালব দেশের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। তাঁর মহিষীর নাম ছিল যশোমতী, প্রভাকরবর্ধন সূর্যভক্ত ছিলেন। সূর্যের কৃপায় তাঁর রাজ্যবর্ধন নামে এক পুত্র হল। তারপর চক্রবর্তী লক্ষণ ধারণ করে তার আরও একটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল। তাঁর নাম হর্ষবর্ধন। আর রাজ্যবর্ধনের যখন ছয়বছর বয়স তখন রানীর এক কন্যা হয়েছিল, তাঁর নাম ছিল রাজ্যশ্রী। এই উচ্ছ্বাসে রানী যশোমতীর ভাইয়ের কথা জানা যায়, যিনি নিজের আট বছরের ছেলে ভণ্ডিকে দুই ভাইয়ের সহচর হিসেবে প্রভাকরবর্ধনের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। রাজা প্রভাকরবর্ধন ভণ্ডিকে (যশোমতীর ভ্রাতুষ্পুত্র) তার তৃতীয় পুত্র বলেই গণ্য করতেন। তিন কুমার যখন যৌবনে পদার্পণ করেছিল তখন রাজা প্রভাকরবর্ধন মালবরাজার দুই কুমার (কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত) হর্ষের সঙ্গী রূপে নিয়ে এসেছিলেন। এদের মধ্যে কুমারগুপ্তের বয়স ছিল আঠার বছর। রাজপুত্রদের এই দুই সঙ্গী (কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত) সব সময় ছায়ার মতোই তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইলেন। এর মধ্যে রাজা প্রভাকরবর্ধনের একমাত্র কন্যা রাজ্যশ্রী যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর বিয়ে হলো মৌখরীবংশীয় কাণ্যকুব্জের রাজা অবন্তিবর্মার জ্যেষ্ঠপুত্র গ্রহবর্মার সঙ্গে। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে রাজ্যশ্রী কাণ্যকুব্জে চলে গেলেন।

## পঞ্চম উচ্ছ্বাস

পঞ্চম উচ্ছ্বাসের শুরুতে দেখা যায় যে, রাজ্যবর্ধন অস্ত্রগ্রহণে যোগ্য বিবেচিত হলে প্রভাকরবর্ধন তাঁকে প্রভুভক্ত সামন্তদের সঙ্গে উত্তরে পাঠিয়েছিলেন হুনদের দমন করবার জন্যে।

Dhaka University Institutional Repository

হর্ষবর্ধনও রাজ্যবর্ধনের সঙ্গী হিসেবে ছিলেন। কিছুদূর পর্যন্ত হর্ষবর্ধন তার ভাইয়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যবর্ধন কৈলাস পর্বতশ্রেণির মধ্যে প্রবিষ্ট হলে, হর্ষ পিছনে পড়ে গেলেন এবং কিছু সময় সেখানে শিকার করে কাটালেন। এরই মধ্যে এক দূত রাজ্য থেকে আসলেন প্রভাকরবর্ধনের গুরুতর অসুস্থতার খবর নিয়ে। হর্ষ এই সংবাদ শোনা মাত্রই কিছু অশ্বারোহীর সঙ্গে বহু পথশ্রম  সহ্য করে রাজধানীতে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন যে, পিতা রোগশয্যায় শায়িত। বিভিন্ন ধর্মের লোক রাজার  আরোগ্যকামনায় রত। স্বামীর মৃত্যু আসন্ন জেনে রানী যশোমতী সতী হলেন। আর এর সামান্য কিছুক্ষণ পরেই রাজা লোকান্তরিত হলেন। হর্ষ পিতার অন্ত্যেষ্টিতে রাজ্যবর্ধনকে পাবার জন্যে আকুল হয়ে দূত প্রেরণ করলেন রাজ্যবর্ধনের কাছে।

## ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসের শুরুতে দেখা যায় প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর এক পক্ষকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময় রাজ্যবর্ধন রাজ্যে ফিরে আসলেন। হুনদের তিনি পরাজিত করেছেন, কিন্তু যুদ্ধে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। পিতার মৃত্যুতে বিমর্ষ রাজ্যবর্ধন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, তিনি রাজসিংহাসনে বসবেন না, সন্ন্যাস গ্রহণ করে বনে চলে যাবেন। ভাইয়ের এই অকস্মাৎ সিদ্ধান্তে হর্ষ বিস্মিত হলেন এবং তাঁরই অনুগামী হবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ইতোমধ্যে রাজ্যশ্রীর সংবাহক নামে এক দূত এসে রাজ্যে প্রবেশ করে জানালো যে, মহারাজ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুসংবাদ কান্যকুব্জে পৌঁছানোর দিনই মালবরাজ রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মাকে হত্যা করেছে এবং রাজ্যশ্রীকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে।

এছাড়াও দূত বলল যে, মালবরাজ স্থানীশ্বর আক্রমণ করতেও উদ্যত হয়েছেন। এই সংবাদ শুনে দুই ভাইয়ের বৈরাগ্য ক্রোধে রূপান্তরিত হলো। হর্ষ সঙ্গে যেতে চাইলেও তাঁকে নিরস্ত করে রাজ্যবর্ধন ভণ্ডিসহ এক হাজার সৈন্যকে নিয়ে মালব আক্রমণ করতে চললেন। বেশ কিছুদিন বাদে অশ্বারোহী সেনানী কুন্তল এসে সংবাদ দিল মালবরাজকে পরাস্ত করলেও রাজ্যবর্ধন নিহত হয়েছেন গৌড়েশ্বরের হাতে। শুনে হর্ষ অধীর হয়ে উঠলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্য তাঁকে উত্তেজিত করেছিলেন প্রভাকরবর্ধনের বৃদ্ধ সেনাপতি সিংহনাদ। তখন সকলের সামনে হর্ষ গৌড়শ্বেরকে বধ করবার শপথ নিলেন এবং বিদেশ সচিব অবন্তিকে ডেকে আজ্ঞা দিলেন যে, তিনি যেন সমস্ত রাজাদের জানিয়ে দেন হয় তাঁরা মাথা নত করবে, না হয় অস্ত্র ধারণ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরের দিন হর্ষ গজসেনাধ্যক্ষ স্কন্দগুপ্তকে ডেকে সমস্ত গজসেনা প্রস্তুত রাখতে আদেশ প্রদান করলেন। এ সময় স্কন্দগুপ্ত আজ্ঞা শিরোধার্য করলেন ঠিকই কিন্তু হর্ষকে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সাবধান হতে পরামর্শ দিলেন এবং বললেন হর্ষ যেন কারো উপরে অতি আস্থা স্থাপন না করেন।

## সপ্তম উচ্ছ্বাস

সপ্তম উচ্ছ্বাসের শুরুতে দেখা যায় যে, হর্ষ রাজ্যাভিষেকের পর শুভ মুহূর্তে বিশ্বজয়ে নির্গত হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে থেমে ছিলেন রাজধানীর কাছেই সরস্বতী নদীর তীরে। আর সেখানেই গ্রাম প্রধান তাঁকে বৃষচিহ্ন সোনার মোহর উপহার দিলেন এবং তাঁর হস্তাক্ষর দিয়ে আজ্ঞাপত্র জারি করতে অনুরোধ করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের যাত্রাপর্বের শেষে যখন হর্ষ অন্য আর একটি স্থানে অবস্থান করছিলেন, তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজকুমারের অন্তরঙ্গ দূত হংসবেগ নিবেদন করলেন, আমাদের রাজকুমার আপনার সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে চান, তিনি আপনার জন্য কিছু উপহার পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে একটি অদ্ভুত ছাতা ছিল, যা ছিল মূলত বরুণদেবের কিন্তু ঘটনাচক্রে রাজার হাতে এসে পড়েছে। রাতের বেলায় হংসবেগ কুমারের বংশের বিস্তৃত পরিচয় দিল। হর্ষ প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজার উপর প্রসন্ন হয়ে তাঁর উপহার গ্রহণ করে বিনিময়ে তাঁকেও বহু উপহার পাঠিয়ে ছিলেন। এরপর হর্ষ গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। পথে হঠাৎ করে ভণ্ডির সাথে সাক্ষাৎ হলো। ভণ্ডি রাজ্যবর্ধনকে দিয়ে মালবরাজকে পরাজিত করে বহু জিনিস এনেছিলেন, সেই সঙ্গে ছিল মালবরাজের বন্দী সেনারাও। ভণ্ডি হর্ষকে আরও জানিয়ে ছিলেন যে, গুপ্ত যখন কান্যকুব্জ অধিকার করছিল তখন রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বিন্ধ্যবনে আশ্রয় নিয়েছেন। তখন হর্ষ গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযানের ভার ভণ্ডির উপর দিয়ে নিজে রাজশ্রীর অন্বেষণে বিন্ধ্যপর্বতে প্রবেশ করেছিলেন।

## অষ্টম উচ্ছ্বাস

অষ্টম উচ্ছ্বাসের শুরুতে দেখা যায় যে, হর্ষ বিন্ধ্যবনে এদিকে ওদিকে ঘুরতে লাগলেন, কিন্তু ভগিনী রাজ্যশ্রীর দেখা পাচ্ছেন না। এই সময়ে বনের সামন্ত শরভকেতুর পুত্র ব্যাঘ্রকেতুর সঙ্গে হর্ষের দেখা হয়েছিল। হর্ষের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে ব্যাঘ্রকেতু তাঁর কাছে নিয়ে এল নির্ঘাত নামে এক ভীল যুবককে, যে কিনা ভীল সেনাপতির ভাগ্নে ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বনের সমস্ত জায়গাই ছিল তাঁর নখদর্পণে। নির্ঘাত রাজাকে দিবাকর মিত্র নামে এক পরাশরী ভিক্ষুর কথা বলেছিল। বিন্ধ্যবনের মধ্যেই ছিল যার আশ্রম।

সেই ভিক্ষু যিনি পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন আর পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তৎক্ষণাৎ হর্ষের মনে পড়ল দিবাকর মিত্র গ্রহবর্মার শৈশবের বন্ধু ছিলেন। নির্ঘাতকে সঙ্গে নিয়ে হর্ষ তাঁর আশ্রমে এলেন ভিক্ষু নানা সম্প্রদায়ের বহু শিষ্য পরিবৃত হয়ে বিরাজিত ছিলেন। ইতোমধ্যে কয়েকজন ভিক্ষু দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, গুরুদেব দারুণ এক অনর্থ হতে চলেছে, তারা বলতে লাগলেন কাছেই এক সুন্দরী যুবতী অগ্নিপ্রবেশ করছেন, তাঁকে বাঁচান। এ কথা শুনেই হর্ষ দিবাকর মিত্র এবং নিজের সঙ্গীদের নিয়ে ঐ স্থানে পৌঁছে দেখলেন যে, চিতা জ্বলছে, রাজ্যশ্রী তাতে ঝাঁপ দেয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু হর্ষবর্ধন রাজ্যশ্রীকে দেখে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। রাজ্যশ্রীও অনুরূপভাবেই হর্ষবর্ধনকে দেখে অশ্রু আর সংবরণ করতে পারলেন না, রাজ্যশ্রীর কাছ থেকেই হর্ষ শুনলেন যে, কীভাবে গৌড়েন্দ্রকৃত অরাজকতার মধ্যে গুপ্ত নামে এক কুলপুত্র তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছিল, কীভাবে তিনি ভাই রাজ্যবর্ধনকে হত্যার পর অনশন শুরু করেছিলেন, কীভাবে এই বিন্ধ্যপর্বতে এসে হতাশ হয়ে অগ্নিপ্রবেশের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এরপর দিবাকর মিত্র হর্ষকে মন্দাকিনী নামের এক একাবলী (রত্নহার) উপহার দিয়েছিল, যা সে নাগরাজ বাসুকির কাছ থেকে পেয়েছিল। এরপর রাজ্যশ্রী ভাইয়ের কাছ থেকে কাষায় গ্রহণের অনুমতি চাইল, কিন্তু হর্ষ রাজ্যশ্রীকে বললেন, সে যেন দিবাকর মিত্রের অভিভাবকতায় থাকে, কারণ গৌড়েশ্বরকে বধ করে সে নিজেও কাষায় গ্রহণ করবে। আর ততদিন রাজ্যশ্রী দিবাকর মিত্রের জ্ঞানোপদেশ নেবেন। দিবাকর মিত্র হর্ষের প্রস্তাব সমর্থন করলে হর্ষ গঙ্গাতীরে তাঁর সেনাদলের মধ্যে ফিরে গিয়েছিলেন।

আর এভাবেই অষ্টম উচ্ছ্বাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

# প্রথম অধ্যায়

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. *ভারতের ইতিহাস*, অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, (প্রাচীন যুগ থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত), প্রকাশক: মৌলিক লাইব্রেরি, ১৮ বি. শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ.২১৯-২২২

২. *'হর্ষচরিত'* বাণভট্ট: *(১৮শ খণ্ড)*, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, প্রধান উপদেষ্টা: ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রকাশক: নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ: ২২ জুন ১৯৮৭, পৃ.১৯

৩. *'কাদম্বরী'* বাণভট্ট: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা- ৭০০০০৬, প্রকাশক: দেবাশিস ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, তৃতীয় প্রকাশ: ১৪০৫, পৃ.১৪

Dhaka University Institutional Repository

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## সংস্কৃত ঐতিহাসিক কাব্যসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে কাব্যের শ্রেণিভেদে ঐতিহাসিক কাব্যের শ্রেণিবিভাগ নেই। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লেখকরা পরবর্তীকালে কাব্যের বিষয়বস্তু অনুসারে এ শ্রেণিভেদ গড়ে তুলেছেন।

ঐতিহাসিক কোনো বিষয় নিয়ে যে সমস্ত কাব্য লিখিত হয়েছে তাকে ঐতিহাসিক কাব্য বলা হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য, নাটক, কথা, আখ্যায়িকা, গীতিকাব্য, চম্পূ, ছন্দ, অলংকার, দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থের অভাব নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রকৃত ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখিত কোনো ইতিহাস গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট পরিধির মধ্যে নেই। একমাত্র বাণ ছাড়া সংস্কৃত কবিগণ তাঁদের কালজয়ী রচনাতে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলে যান নি, যার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস তো দূরের কথা, আমরা আমাদের কবিগণের জীবনী সম্বন্ধে ও কিছু জানিনা। তাই অধ্যাপক AB Keith তাঁর 'The Ancient History of India' গ্রন্থে বলেছেন যে, .... 'in the whole of the great period of Sanskrit literature there is no one writer who can be seriously regarded as a critical historian.'[১] প্রাচীনকাল থেকেই 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা', 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, ত্যাগাচ্ছান্তির্নিরন্তরম্, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' -এই শ্রেণির কথাই ভারতের ধর্মপ্রচারকগণ প্রচার করেছেন।

রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ সাহিত্যে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলোকে আমরা প্রকৃত ইতিহাস বলতে পারি না। সংস্কৃত সাহিত্যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কিছু কিছু কাব্য রচিত হয়েছে। এগুলোই প্রকৃত ঐতিহাসিককাব্য বলে পরিচিত।[২]

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে সংস্কৃত ঐতিহাসিক কাব্যসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো:

## হর্ষচরিত

কাব্য সাহিত্যের যুগে বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। বাণভট্ট মহারাজ হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৬৪৭) সভাকবি ছিলেন। গ্রন্থের নাম থেকে মনে হয়, এতে হর্ষবর্ধনের জীবনকাহিনী বিধৃত। কিন্তু তা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। রাজা হর্ষের জীবনের কয়েকটি মর্মান্তিক ঘটনাই এ কাব্যের বিষয়বস্তু। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, বাণ এই গ্রন্থ কাব্য হিসেবেই রচনা করেছেন, তবু এতে ইতিহাসের বেশ কিছু উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় ৭ম শতকের প্রথম ভাগে এই কাব্য রচিত হয়।[৩]

## রাজতরঙ্গিণী

দ্বাদশ শতকের কাশ্মিরী কবি কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিণী' ঐতিহাসিক কাব্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন ও সমসাময়িক গ্রন্থ, প্রচলিত কাহিনী এবং শিলালিপি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নিরপেক্ষভাবে তথ্য পরিবেশন করায় এ কাব্যটিই কেবল ইতিহাসের অনেকটা কাছাকাছি এসেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কাশ্মীরের সিংহাসন নিয়ে যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছিল তা এ কাব্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। কাব্যটিতে কাশ্মীরের অতি প্রাচীন রাজবংশের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা আনুমানিক ও অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়।

কিন্তু গ্রন্থকার যতই পরবর্তীকালের ইতিহাসে এসেছেন ততই তিনি সত্যের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। কাশ্মীরে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানকার শাসনকর্তা জয়নাল আবেদিনের পৃষ্ঠপোষকতায় কল্‌হন তাঁর 'রাজতরঙ্গিণী' (১১৪৮-১১৪৯ খ্রিষ্টাব্দ) রচনা শেষ করেন।[৪]

## নবসাহসাঙ্কচরিত

অষ্টাদশ সর্গে রচিত পদ্মগুপ্তের 'নবসাহসাঙ্কচরিত' (১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ) একটি ঐতিহাসিক কাব্য। পদ্মগুপ্তের পিতার নাম মৃগাঙ্কগুপ্ত। তিনি পরমার রাজবংশীয় নরপতি মুঞ্জরের সভাকবি ছিলেন।এই মুঞ্জরেরই আর এক নাম ছিল নবসাহসাঙ্ক।

Dhaka University Institutional Repository

১৮ সর্গে লিখিত এই কাব্যে (১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ) নাগরাজকুমারী শশিপ্রভার সাথে সিন্ধুরাজের বিয়ের বর্ণনা রয়েছে। মৃগয়ায় বহির্গত রাজা গলদেশে স্বর্ণ শৃঙ্খলযুক্ত এক মৃগকে বাণ বিদ্ধ করেন। মৃগ পলায়ন করে। শশিপ্রভারই প্রিয়মৃগ শশিপ্রভার নিকটেই উপস্থিত হয়। মৃগের গাত্রবিদ্ধ বাণ হতেই শশিপ্রভা রাজার নাম জানতে পারে। এদিকে মৃগের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে রাজা আসলেন এক সরোবরের তীরে। তাতে দেখলেন এক মরাল, চঞ্চুতে তার দোদুল্যমান এক মুক্তাহার। মুক্তায় খোদিত নাম থেকে রাজা জানতে পারলেন শশিপ্রভার কথা। শশিপ্রভা কর্তৃক মুক্তাহারের অন্বেষণে প্রেরিতা পরিচারিকার সাথে রাজার সাক্ষাৎ হয়। শশিপ্রভাকে লাভ করবার জন্য রাজা নাগলোক আক্রমণ করেন এবং বজ্রাঙ্কুশকে নিহত করে শশিপ্রভার পাণিগ্রহণ করেন। [৫]

## বিক্রমাঙ্কদেবচরিত

অষ্টাদশ সর্গে বিহ্লনের (১১শ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে) বিক্রমাঙ্কদেবচরিত ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত। বিহ্লন ছিলেন কাশ্মিরী কবি, রাজবংশের যুদ্ধ এবং বিয়ে নিয়ে রচিত এই কাব্যে বিহ্লন কল্যাণরাজ বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লের যশোগান গেয়েছিলেন। কাব্যের প্রথম দিকে চালুক্য রাজবংশের সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। সিংহাসনে আরোহণ করবার পূর্বে বিক্রমাদিত্য কর্তৃক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় সোমেশ্বরের সিংহাসনচ্যুতি, চোলগণের সাথে বিক্রমাদিত্যের যুদ্ধ প্রভৃতি ইতিহাসের বহু সংবাদ এই কাব্যে পাওয়া যায়। বিহ্লন কবিরূপেই অধিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। পঞ্চম অঙ্কে বর্ণিত আহবমল্লের মৃত্যুদৃশ্য কাব্যাংশে অতীব উৎকৃষ্ট।[৬]

## রামচরিত

বঙ্গীয় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত (খ্রিষ্টাব্দ ১০৮৪-১১২৪ রচিত) 'রামচরিতে' দ্ব্যর্থক ভাষায় রামকাহিনি এবং বঙ্গদেশের রাজা রামপালের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থের শেষে কবি প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, কবির পিতার নাম প্রজাপতি নন্দী, পিতামহের নাম পিণাক নন্দী, জন্ম বারেন্দ্রের অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধনের বৃহদ্‌বটু গ্রামে। জাতিতে তিনি ছিলেন কায়স্থ। সন্ধ্যাকরের পিতা ছিলেন রামপালের সন্ধিবিগ্রহিক।

Dhaka University Institutional Repository

রামচরিতে পালবংশের কাহিনী, প্রধানত রামপালের (খ্রিষ্টাব্দ ১০৮৪-১১২৪) কৃতিত্ব বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য এবং রামায়ণের কাহিনীটি সেখানে ছিল গৌণ। দিব্যোকের নেতৃত্বে বরেন্দ্রবিদ্রোহ এই কাব্যের একটি প্রধান ঘটনা। সন্ধ্যাকরনন্দী (১০৫৭-১০৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত খ্যাতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৭]

## কুমারপালচরিত

জৈন কবি হেমচন্দ্র রচিত কুমারপালচরিত (খ্রিষ্টাব্দ ১০৮৮-১১৭২) একটি ঐতিহাসিক কাব্য। ২৮ সর্গে রচিত এই কাব্যে চালুক্যরাজ কুমারপালের এবং তাঁর পূর্ব-পুরুষদের জীবনেতিহাস বর্ণিত।[৮]

## পৃথ্বিরাজবিজয়

এই কাব্যের লেখকের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় নি। এ কাব্যে ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দের সময়কার রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে শাহাবউদ্দিন ঘোরীর বিরুদ্ধে পৃথ্বিরাজের জয়লাভের কথা বর্ণিত হয়েছে। ঐতিহাসিক দিক থেকেও গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ।[৯]

## রাজবলীপতাকা

'রাজবলীপতাকা'একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ। সম্রাট আকবরের সময় কাশ্মীরের অবস্থা বর্ণনা করেছেন লেখক প্রিয়ভট্ট। লেখকের বর্ণনাতেই তৎকালীন কাশ্মীরের সমগ্র অবস্থার এক পরিষ্কার বিবরণ পাওয়া যায়, যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

এছাড়াও সোমেশ্বর দত্তের 'কীর্তিকৌমুদী', সর্বানন্দের 'জগডুচরিতম', মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধ চিন্তামণি' রাজশেখরের 'প্রবন্ধকোষ', বিদ্যাপতির কীর্তিলতা প্রভৃতি কম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থেও প্রাচীন ভারতের কিছু কিছু ইতিহাস বিধৃত আছে।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. *The Ancient History of India,* AB Keith, Published by Oxford University, First Edition: 1924, P. 345-346

২. *History of Indian Literature,* Vol. II, P. 182

৩. *The Harshacharita of Banabhatta,* Edited With an Introduction and Notes by Mahamahopadhya P.V. Kane, Published by Motilal Banarsidass Indological Publishers and Book Sellers, First Edition: 1918, P. 1-10

৪. *রাজতরঙ্গিণী:* কবিবর কল্‌হন প্রণীত, সংস্কৃত কাশ্মীর রাজতরঙ্গিণীর বঙ্গানুবাদ, অনুবাদক: হরিলাল চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা: অমিত ভট্টাচার্য, প্রকাশক: পারুল প্রকাশনী প্রাঃলিঃ, ৮/৩ চিন্তামনি দাস লেন, কলিকাতা- ৭০০০০৭৯, প্রথম সংস্করণ: ২০১৩, পৃ. ১-১৫

৫. *সিদ্ধান্তকৌমুদীর আলোকে কৃৎপ্রত্যয়বিচার,* ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য, প্রকাশক : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ: অগ্রহায়ন: ১৪০২, দ্বিতীয় প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ১৪২-১৪৩

৬. প্রাগুক্ত ঐ পৃ. ১৩৪-১৪৩

৭. *সংস্কৃত মঞ্জুষা,* ড. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস, প্রকাশক: বেদবাণী প্রকাশনী, গোপালগঞ্জ, ত্রয়োদশ সংস্করণ: ২০০৬, পৃ. ৬৭

৮. প্রাগুক্ত ঐ পৃ. ৬৮

৯. প্রাগুক্ত ঐ পৃ. ৬৮-৬৯

১০. প্রাগুক্ত ঐ পৃ. ৬৯-৭০

Dhaka University Institutional Repository

# তৃতীয় অধ্যায়

## ‘হর্ষচরিত-এর প্রাক্‌কাল (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত) ও এর সমসাময়িক কালের ইতিহাসের উপাদান ও তৎকালীন সামাজিক অবস্থা

‘হর্ষচরিত’-এর সমসাময়িক কালের ইতিহাসের উপাদান ও তৎকালীন সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে হলে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের দিকে। কেননা ‘হর্ষচরিত’-এর ইতিহাস বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাচীন ইতিহাসের ধারাবাহিকতার ফল।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান রূপে বিদেশী লেখক ও পর্যটকদের লিখিত বিবরণী বিশেষ মূল্যবান। গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস $(Herodotos)$ ভারতে না এলেও পারস্য কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজ্যজয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ‘হিস্টোরিয়া’ $(Historia)$ নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, উত্তর-ভারত পারস্য সম্রাট দারায়ুসের সম্রাজ্যভুক্ত বিংশতম প্রদেশ ছিল।

বিদেশী গ্রন্থকারদের রচনা থেকে ভারতের সমসাময়িক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। এদের মধ্যে মেগাস্থিনিস, $(Megasthenes$, আরিয়ান $(Arian)$, কার্টিয়াস$(Cartius$, প্লুটার্ক$(Plutarch)$, ডিয়োডোরাস $(Diodoros)$ প্রমুখ গ্রিক ও রোমান ঐতিহাসিকদের বিবরণী বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি। এছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিদেশী পর্যটক এবং ঐতিহাসিক পর্যটক ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলেন। যাদের মধ্যে চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং, চৈনিক ঐতিহাসিক সু-মা-ফিয়েন এবং তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাম উল্লেখযোগ্য। এসব ঐতিহাসিকদের অমূল্য বিবরণের কারণেই হয়তো ভারতের অজানা ইতিহাসও আমরা জানতে পেরেছি, আর এসব ইতিহাসই আজ মূল্যবান দলিল রূপে পরিগণিত।[১]

Dhaka University Institutional Repository

# পঞ্চম শতক

## গুপ্তবংশ

গুপ্তবংশের উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। শুঙ্গ ও সাতবাহন আমলের ভারতীয় দলিলপত্রে 'গুপ্ত' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্তরাজাদের আদি বাসস্থান ছিল মগধে। সম্ভবত গুপ্তরাজারা প্রথমে বাংলাদেশেই রাজত্ব করতেন এবং পরে তারা মগধে রাজ্যবিস্তার করেন।

ডক্টর ডিসি গাঙ্গুলীর মতে, গুপ্তরাজাদের বাসস্থান ছিল বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে। তিনি চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং- এর বক্তব্যের উপর নির্ভর করেই নিজের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, গুপ্তরাজাদের আদি বাসস্থান ছিল মগধে।[২]

## শ্রীগুপ্ত

(২৪০-২৮০ খ্রিষ্টাব্দ) প্রভাবতী গুপ্তের পুনা তাম্র-অনুশাসন লিপিতে শ্রীগুপ্তকে গুপ্তবংশের অধিরাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ডক্টর আর সি মজুমদারের মতে গুপ্তবংশের শ্রীগুপ্ত ও ইৎসিং কর্তৃক উল্লিখিত শ্রীগুপ্ত অভিন্ন।[৩]

## ঘটোৎকচ

ঘটোৎকচকে শ্রীগুপ্তের পুত্র ও উত্তরাধিকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী গুপ্তের দুটি অনুশাসনলিপিতে ঘটোৎকচকে প্রথম গুপ্তরাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার রাজ্যকাল বা রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

## প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০-৩৪০ খ্রিষ্টাব্দ)

গুপ্তরাজাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। সম্ভবত ৩২০ খ্রিষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর রাজ্যজয় সম্পর্কে বিশেষকিছু জানা যায় না। ধারণা করা হয় যে, তিনি সমগ্র বিহার, উত্তর প্রদেশ ও বাংলাদেশের কিছু অংশে আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

## সমুদ্রগুপ্ত

এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায় যে, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। সমুদ্রগুপ্তের পূর্বনাম ছিল 'কচ' এবং রাজ্যজয়ের পর তিনি 'সমুদ্রগুপ্ত' নাম ধারণ করেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর সমুদ্রগুপ্তই সমগ্র ভারতে এক সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপন করেছিলেন। তার সামরিক অভিযানের ব্যাপকতা এবং রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের বিস্তৃতি লক্ষ করে স্মিথ তাঁকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলেছিলেন।
তার কূটনৈতিক দূরদর্শিতা বহুমুখী প্রতিভা ও পরমতসহিষ্ণুতা তাকে এক অনন্য মর্যাদার আসনে আসীন করেছিল।

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেছিল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৮০-৪১৩ খ্রিষ্টাব্দ), পরবর্তীতে কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য (৪১৪-৪৫৫ খ্রিষ্টাব্দ), এবং স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৪৫৫-৪৬৭ খ্রিষ্টাব্দ) কেউই সমুদ্রগুপ্তের মতো রাজ্যবিস্তার করতে পারেননি।

মৌর্য শাসনব্যবস্থার পরিপূরক হলো গুপ্তশাসনব্যবস্থা। মৌর্যদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থা সংশোধিত অবস্থায় দেখা যায় এই গুপ্তশাসন ব্যবস্থায়। সুতরাং মৌর্যদের তুলনায় গুপ্তদের শাসন ব্যবস্থা ছিল অধিক উন্নত মানের। গুপ্তসাম্রাজ্য 'রাজতন্ত্র' ও 'প্রজাতন্ত্র' এই দু'ধরনের শাসন ব্যবস্থায় পরিচালিত হতো।

গুপ্তযুগকে ভারতের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়। গুপ্ত সম্রাটের সামরিক প্রতিভাবলে একদিকে যেমন এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, অন্যদিকে তাদের সুদক্ষ শাসন গুণে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমুন্নত ছিল। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অপূর্ব বিকাশ ঘটে এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসারহেতু ভারতের অর্থনৈতিক মান উন্নত হয়। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পের উৎকর্ষতা এই যুগকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছিল।

পরবর্তী স্কন্দগুপ্তের উত্তরাধিকারীদের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। প্রথম দুজন দুর্বল রাজার পর (পুরগুপ্ত ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত) এই বংশের অপর শক্তিশালী রাজা ছিলেন বুধগুপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সম্ভবত ৫০০ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। বুধগুপ্তের সাম্রাজ্য বাংলাদেশ থেকে মালব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে একাধিক গুপ্তরাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক ইতিহাসে বা রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নি। গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে মৌখরীদের দ্বারা এই বংশের অবসান ঘটে। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর পূর্ব-ভারতে আদিত্যসেন নামে এক গুপ্তরাজা কর্তৃক গুপ্তসাম্রাজ্য ক্ষণকালের জন্য পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীতে এই সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে।

## গুপ্তসাম্রাজ্য

### তথ্যাদি

গুপ্তসাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনায় উপাদানের অভাব নেই। গুপ্তসাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনায় নিম্নলিখিত উপাদনগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য-

**(১) পুরাণঃ** গুপ্তরাজাদের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় পুরাণ হলো উল্লেখযোগ্য উপাদান। পুরাণের সংখ্যা হল ১৮। এদের মধ্যে 'বায়ুপুরাণ', 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ,' 'মৎস্যপুরাণ', 'বিষ্ণুপুরাণ' ও 'ভাগবত পুরাণ' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এসব পুরাণ থেকে গুপ্তসাম্রাজ্য, এর সীমানা ও প্রদেশগুলির বিবরণ পাওয়া যায়। এগুলি থেকে গুপ্তরাজাদের নাম এবং গুপ্তসাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ও বহির্ভূত অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাণ থেকে সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক রাজবংশের যথা- বকাটক, নাগ, শক প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া যায়।

**(২) ধর্মশাস্ত্রঃ** ধর্মশাস্ত্র থেকেও প্রয়োজনীয় বিবরণ পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রগুলির অধিকাংশই গুপ্তযুগে রচিত হয়েছিল।

**(৩) কামন্দক নীতিসারঃ** দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী শিখর কর্তৃক এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল। এতে রাজ-কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশাবলি সন্নিবিষ্ট আছে।

**(৪) নাটকঃ** গুপ্তযুগের রচিত নাটকগুলিও গুপ্তসাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনার উল্লেখযোগ্য উপাদান।

**(ক) 'কৌমুদী মহোৎসব'** নামক নাটক থেকে সেই যুগের মগধের রাজনৈতিক অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। ডক্টর জয়স্বাল-এর মতে এই নাটকখানি ৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। ডক্টর দীক্ষিত এর মতে এই নাকটখানি থেকে গুপ্তবংশের উন্নতি ও উত্থানের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

**(খ) 'নাট্যদর্পণ'** নামক নাটক থেকে জানা যায় যে, রামগুপ্ত ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। রামগুপ্ত ও এক শকরাজের মধ্যে যুদ্ধে রামগুপ্ত পরাজিত হয়ে নিজ মহিষী ধ্রুবদেবীকে শকরাজের হাতে সমর্পণ করেন। যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত নারীর পোশাকে শকরাজের শিবিরে প্রবেশ করে শকরাজকে হত্যা করেন। এর পর চন্দ্রগুপ্ত রামগুপ্তকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

**(গ) 'মুদ্রারাক্ষস'** বিশাখদত্ত কর্তৃক রচিত এই নাটকখানি অপর মূল্যবান উপাদান। যদিও এতে মৌর্যসাম্রাজ্য সম্পর্কেই বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে- তথাপি গ্রন্থকার গুপ্তসাম্রাজ্য সম্পর্কেও বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এ থেকেও গুপ্তরাজাদের ধর্ম সম্বন্ধে জানা যায়। এতদ্ভিন্ন এতে শক, যবন, কম্বোজ, গান্ধার প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের বিবরণও সন্নিবিষ্ট রয়েছে।[৪]

**(৫) বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণী:** ফা-হিয়েন ও ইৎসিং নামক পরিব্রাজকদের বিবরণীও গুপ্তসাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

**(৬) অনুশাসনলিপি:** গুপ্তযুগে উৎকীর্ণ অনুশাসনলিপিগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথেষ্ট। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি; উদয়গিরির গুহালিপি; 'মথুরার-শিলালিপি', 'সাঁচীর-শিলালিপি', ভিতরী-স্তম্ভলিপি'; উদয়গিরির-গুহালিপি', 'মথুরার-শিলালিপি; সাঁচীর-শিলালিপি', 'ভিতরী-স্তম্ভলিপি' প্রভৃতি থেকে গুপ্তরাজাদের কৃতিত্ব এবং তাঁদের ধর্ম সম্বন্ধেও জানা যায়।

**(৭) মুদ্রা:** গুপ্তসাম্রাজ্যের ইতিহাস ও গুপ্তরাজাদের কৃতিত্ব সম্পর্কে গুপ্তরাজাদের প্রচারিত মুদ্রা উল্লেখযোগ্য উপাদান। মুদ্রা থেকে গুপ্তসাম্রাজ্যের বিস্তৃতির কথা জানা যায়।

**গুপ্তবংশের উত্থানের প্রাক্কালে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা**

কুষাণদের পতন ও অন্ধ্রবংশের বিলুপ্তির সময় থেকে গুপ্তবংশের উত্থান- এই অন্তর্বর্তীকালকে স্মিথ ভারতের ইতিহাসের এক 'অন্ধকার যুগ' (Dark age) বলে অভিহিত করেছেন। মগধেও গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হলে এই অন্ধকার যুগের অবসান হয়ে এক নতুন গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। কুষাণদের পতনের সুযোগে ভারতের স্থানীয় নৃপতিরা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে কুষাণসাম্রাজ্যের পতন ও গুপ্তসাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের মাঝামাঝি সময়ে উত্তর-ভারতে একাধিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র শাসিত রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

রাজতন্ত্র শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে নাগ, অহিচ্ছত্র, অযোধ্যা, কৌশাম্বী, বকাটক প্রভৃতি রাজ্যগুলি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রজাতন্ত্র রাজ্যগুলির মধ্যে অর্জুনয়ন, মালব, কুনিন্দ প্রভৃতি রাজ্যগুলি ছিল উল্লেখযোগ্য।

**(১) নাগরাজ্যঃ** নাগরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করেছিল। পুরাণ থেকে জানা যায় যে, নাগরাজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল বিদিশা, কান্তিপুরা, মথুরা ও পদ্মাবতী। বিদিশার নাগরাজাদের মধ্যে শিশ, ভোগী ও সদাচন্দ্রের নামোল্লেখ করা যায়। অনুশাসনলিপি থেকে জানা যায় যে, মহারাজ ভবনাগ নামে এক নাগরাজ ছিলেন প্রথম রুদ্রসেনের মাতামহ এবং প্রথম রুদ্রসেনের পৌত্র ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসায়িমক। কুষাণসাম্রাজ্যের পতনের যুগে ভবনাগ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলন। 'এলাহাবাদ-স্তম্ভলিপিতে' নাগদের বিরুদ্ধে সমুদ্রগুপ্তের যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ আছে। নাগবংশের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন হয়েছিল। পুরাণে পদ্মাবতী রাজ্যের নয়জন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। মথুরারাজ্যের নাগরাজ মহারাজা বীরসেন ছিলেন পরাক্রান্ত।

**(২) অহিচ্ছত্ররাজ্যঃ** মুদ্রা থেকে অহিচ্ছত্ররাজ্যের রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত প্রথম তিন খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে তারা রাজত্ব করতেন। এদের মধ্যে ভদ্রঘোষ, সূর্যমিত্র, অগ্নিমিত্র ও ফাল্গুনীমিত্র ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

**(৩) অযোধ্যারাজ্যঃ** মুদ্রা থেকে অযোধ্যারাজ্যের রাজাদের মধ্যে ধনদেব ও বিশাখদেবের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত ধনদেব ছিলেন কোশলের রাজা এবং অনেকের মতে তিনি ছিলেন পুষ্যমিত্রের বংশধর।

**(৪) কৌশম্বীরাজ্যঃ** কৌশম্বীরাজ্যের রাজাদের মধ্যে সুদেব, অশ্বঘোষ, অগ্নিমিত্র, দেবমিত্র, বরুণমিত্র প্রমুখের নাম পাওয়া যায়।

**(৫) বকাটকরাজ্যঃ** বকাটকরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিন্ধ্যাশক্তি। তিনি বহু যুদ্ধবিগ্রহ করে নিজ রাজ্য সম্প্রসারিত করেছিলেন। সমসাময়িক মুদ্রায় তাঁকে ইন্দ্র ও বরুণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম প্রবরসেন ছিলেন ঐ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা।

তিনি নর্মদা নদী পর্যন্ত নিজ রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। কথিত আছে যে, রাজ্যজয়ের পর তিনি সাতটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি সম্রাট উপাধি ধারণ করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম প্রবরসেনের পর প্রথম রুদ্রসেন বকাটক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক। সম্ভবত প্রথম রুদ্রসেন ও 'এলাহাবাদ-স্তম্ভলিপিতে' উল্লিখিত রুদ্রদেব ছিলেন অভিন্ন।

**(৬) অর্জুনয়নরাজ্য:** ভারতপুর ও আলোয়ার নিয়ে অর্জুনয়ন প্রজাতন্ত্রশাসিত রাজ্যটি গঠিত ছিল। ব্যাক্ট্রীয়ান গ্রিকদের পরেই অর্জুনয়নরা ক্ষমতাশালী হয়েছিল। সাময়িকভাবে শকরা অর্জুনয়নদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু কুষাণদের পরে পুনরায় অর্জুনয়নরা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। অবশেষে এরা গুপ্তরাজাদের প্রভুত্ব স্বীকার করে নেয়।

**(৭) মালবরাজ্য:** মালবরাজারা ছিলেন আলেকজান্ডারের সমসাময়িক। এক সময় এই রাজ্য পাঞ্জাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে মালবরা আধুনিক রাজস্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। জয়পুরের সন্নিকটে মালবনগর ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। এরা বিক্রম অব্দের অনুসরণ করত। শকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মালবরা জয়লাভ করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশেষে এরা গুপ্তরাজাদের প্রভুত্ব স্বীকার করে নেয়।

**(৮) কুনিন্দরাজ্য:** মুদ্রা থেকে কুনিন্দরাজ্যের ইতিহাস জানা যায়। যমুনা ও শতদ্রুনদীর মাঝামাঝি অঞ্চলে এই রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। কুনিন্দ শাসকদের মধ্যে অমোঘভূতির নাম পাওয়া যায়।

**(৯) কুলতরাজ্য:** কুনিন্দরা কুলতগণ কর্তৃক বিজিত হয়েছিল। এরা কাবুল উপত্যকায় বসবাস করত। মুদ্রা থেকে বীর্যস্য ও ভদ্রস্য-এর নাম পাওয়া যায়। অবশেষে কুলতরা গুপ্তরাজগণ কর্তৃক বিজিত হয়।

## গুপ্তবংশের উৎপত্তি

গুপ্তবংশের উৎপত্তি ও এর প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুঙ্গ ও সাতবাহন আমলের ভারতীয় দলিলপত্রে 'গুপ্ত' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু যথার্থ গুপ্তরাজবংশের সঙ্গে 'গুপ্ত' নামধারী ব্যক্তিবিশেষের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ডক্টর জয়স্বাল ব্যাকরণবিদ্ চন্দ্রগোমিনের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে গুপ্তদের পাঞ্জাবের জাঠগোষ্ঠীভুক্ত বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই অভিমতের কোনো যথোপযুক্ত প্রমাণ নেই। ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী গুপ্তদের ধরনগোত্রীয় বলে মনে করেন। কিন্তু এই অভিমত যথার্থ নয় বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। ডক্টর এস. চট্টোপাধ্যায় পাঞ্জোভ তাম্র অনুসশানের ওপর ভিত্তি করে গুপ্তদের ক্ষত্রিয় বলে অভিহিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর জয়সোয়ালের মতে নাগরাজবংশের সামন্ত হিসেবে গুপ্তরা প্রয়াগে বসবাস করতেন এবং পরবর্তীকালে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অ্যালান এর মতে গুপ্তরা সর্বপ্রথম মগধে রাজ্য স্থাপন করেন। ডক্টর ডি.সি. গাঙ্গুলীর মতে গুপ্তরাজাদের আদি বাসস্থান ছিল বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে, মগধে নয়। তিনি চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং-এর বক্তব্যের ওপর নির্ভর করেই এই মতামত প্রকাশ করেছেন। ইৎসিং ৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন। ইৎসিং এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, তাঁর ভারত পরিভ্রমণের পাঁচশ বছর পূর্বে 'মহারাজ' শ্রীগুপ্ত নামে এক রাজা চৈনিক ধর্মযাজকের জন্য নালন্দার ২৪০ মাইল পূর্বদিকে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এটি 'চীনের মন্দির' নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং ইৎসিং-এর বর্ণনা অনুসারে নালন্দার পূর্বদিকে অবস্থিত বাংলাদেশকেই বুঝায় এবং মহারাজ শ্রীগুপ্ত খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করতেন বলে মনে হয়। 'বিষ্ণুপুরাণ', 'বায়ুপুরাণ' ও 'ভাগবত পুরাণে' বলা হয়েছে যে, গুপ্তরাজাদের আদি বাসস্থান ছিল মগধে। সম্ভবত গুপ্তরাজারা প্রথমে বাংলাদেশেই রাজত্ব করতেন এবং পরে তাঁরা মগধে রাজ্যবিস্তার করেন।[৫]

## গুপ্তসভ্যতা

## ভারত ইতিহাসের সুবর্ণযুগ

ভারতের ইতিহাসে গুপ্তশাসনকাল এক গৌরবময় অধ্যায়। গুপ্ত সম্রাটদের সামরিক প্রতিভাবলে যেমন একদিকে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল ও ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দূর হয়েছিল, তেমন অপরদিকে তাঁদের সুদক্ষ শাসনগুণে দেশের নিরাপত্তা বহুদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অপূর্ব বিকাশ ঘটে এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসারহেতু ভারতের অর্থনৈতিক মান উন্নত হয়। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পের উৎকর্ষ এই যুগকে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। ঐতিহাসিক বার্নেট (Barnett) গুপ্তযুগকে গ্রিসের পেরিক্লিসের যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, "গ্রিসের ইতিহাসে পেরিক্লিসের যুগ যে স্থান অধিকার করে আছে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে গুপ্তযুগও সেই স্থান অধিকার করে আছে" (The Gupta period is in the annals of classical India almost what the Periclean age is in the history of Greece")। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পেরিক্লিস এথেন্সের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় এথেন্সের সামরিক শক্তি, আর্থিক সম্পদ ও শিল্পের চরম উন্নতি হয়। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অনেকেই পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সে আবির্ভূত হয়েছিলেন; যথা ইস্কাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিডিস প্রমুখ নাট্যকার, ভাস্কর ফিডিয়াস ও স্থপতি ইক্টিলাস। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে পেরিক্লিসের যুগকে যেমন গ্রিক ইতিহাসের সুবর্ণযুগ বলা হয় অনুরূপভাবে গুপ্তযুগকেও ইতিহাসের সুবর্ণযুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৬]

## রাজনৈতিক ঐক্য ও সুদক্ষশাসন

কুষাণসাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রায় এক শতাব্দীকাল ভারত উপমহাদেশে কোনো সার্বভৌম রাজশক্তির অভ্যুত্থান ঘটেনি। পশ্চিম পাঞ্জাবের কুষাণরা, গুজরাট ও মালবের শকরা এবং উত্তর-ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বহু ক্ষুদ্র রাজারা রাজত্ব করছিলেন। এই সব রাজ্যগুলির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়।

এইরূপ রাজনৈতিক অনৈক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেই স্মিথ মন্তব্য করেছেন, "India was divided into a large number of independent state whose varying fortunes and mutual struggles; it is not possible to ennumerate in any datail." এই পরিস্থিতিতে গুপ্তরাজাদের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উত্থান ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়ে গুপ্তরাজারা এক সর্বভারতীয় সার্বভৌম রাজশক্তি ও উন্নত ধরনের সভ্যতার সৌধ রচনা করেন। প্রায় দুশত বছর ধরে গুপ্তরাজারা ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য বজায় রাখতে সমর্থ হন। যদিও উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে তাঁরা আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন নি। গুপ্তরাজাদের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিভাবলে একে একে পহ্লব, কুষাণ ও শকরাজ্যগুলি বিলুপ্ত হয়, রাষ্ট্রীয় ঐক্য পুনঃস্থাপিত হয় এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

গুপ্তরাজাদের কৃতিত্ব শুধু রাজ্যবিস্তারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তাঁরা দক্ষতার পরিচয় দেন। ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, গুপ্তশাসন প্রণালী ছিল উন্নত, দণ্ডবিধি ও ধর্মনীতি ছিল উদার।

Dhaka University Institutional Repository

গুপ্তরাজারা সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়েও ছিলেন প্রজাহিতৈষী এবং তাঁদের প্রজাহিতৈষণা বিদেশী পর্যটক ও গ্রন্থকারদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল। রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও উন্নত শাসনব্যবস্থার প্রচলন হেতু দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নত হয়ে উঠেছিল।[৭]

## অর্থনৈতিক উৎকর্ষ

মুদ্রা, লিপি ও ফা-হিয়েনের বিবরণী থেকেও গুপ্তযুগের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

### নগর

এই যুগে ভারতের সর্বত্র বহু নগরীর প্রতিষ্ঠা অর্থনৈতিক উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। ফা-হিয়েনের বর্ণনানুসারে মগধ ছিল সমৃদ্ধ দেশ এবং এখানকার নগরগুলি ছিল সুসজ্জিত ও জনসাধারণ ছিল সমৃদ্ধ। এই যুগের অন্যান্য নগরগুলির মধ্যে ইন্দ্রপুর, চন্দ্রপুর, অযোধ্যা ও পাটলিপুত্র ছিল অন্যতম। নগরগুলির পরিকল্পনা ও সেগুলির জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপের বর্ণনা থেকে যথাক্রমে শিল্পকলার উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আভাস পাওয়া যায়।[৮]

## কৃষি ও শিল্প

গুপ্তযুগে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ উন্নতিলাভ করে। কৃষি ছিল অর্থনৈতিক জীবনের মূলভিত্তি। কৃষির উন্নয়নের প্রতি রাষ্ট্রের সজাগ দৃষ্টি ছিল। এই যুগের সাহিত্যে ৬৪টি রকমের শিল্পের উল্লেখ রয়েছে। এগুলির মধ্যে ধাতুশিল্প, চর্মশিল্প, বস্ত্রশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, লৌহশিল্প ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিল্লী ও ধর-এ অবস্থিত লৌহস্তম্ভ দুটি এই যুগেই নির্মিত হয় এবং তা লৌহশিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 'নিগম-প্রতিষ্ঠান' (Guids) গুলি অংশগ্রহণ করত। কোথাও নিগমগুলি বৃত্তিমূলক (Craftguild) শিল্পীদের নিয়ে বিশেষ একটি শিল্পোৎপাদনকার্যে নিযুক্ত থাকত। আবার কোথাও বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের যথা- 'শ্রেষ্ঠী' (Bankers) 'স্বার্থবাহ' (Sarthavaha) ও 'বণিক্' (Kulika) এগুলি গঠিত হতো। এই মিশ্রিত নিগমগুলি অনেকটা আধুনিক কালের চেম্বার অফ্ কমার্স (Chamber of commerce) এর কার্য সম্পাদন করত। দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিগমগুলির পরিচালনাধীন ছিল। প্রত্যেকটি নিগম-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব 'সভাপতি' বা 'শ্রেষ্ঠী' ছিলেন। সমৃদ্ধশালী বণিক ও ব্যবসায়ীরা স্থানীয় শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

কোটিবর্ষের 'বিষয়াপতি' বিভিন্ন শ্রেণির বণিকদের নিয়ে গঠিত একটি 'পরামর্শক-সভা'র (Board of Advisers) সাহায্যে দেশ শাসন করতেন এইরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে।[৯]

## ব্যাংক

সেই যুগে ব্যাংক (Bank) এরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈশালী, কোটিবর্ষ প্রভৃতি বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে ব্যাংকগুলি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। নিগমগুলিই ব্যাংক-এর কার্য সম্পাদন করত, নগদ অর্থ বা সম্পত্তির স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে জামানত (স্মৃতিনিধি) রাখত। স্কন্ধগুপ্তের ইন্দোর তাম্রলিপিতে নিগম প্রতিষ্ঠানের হাতে মন্দিরের সম্পত্তি জামানত রাখার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০]

## মুদ্রা

গুপ্তযুগে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার প্রচলন ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ছিল। গুপ্তযুগে সামুদ্রিক বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নত ছিল। সৌরাষ্ট্র প্রদেশ ও আরবসাগরের উপকূলে অবস্থিত বন্দরগুলি গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। এই যুগের বন্দরগুলির মধ্যে তাম্রলিপ্ত, কয়াল, ব্রোচ, সোপারা, কল্যাণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জলপথে ব্রহ্মদেশ, মালয়, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশের সঙ্গে এবং স্থলপথে মধ্য-এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক মান বহির্বিশ্বের সঙ্গে পণ্য বিনিময়ের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক মান পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে এই বাণিজ্যপথ ধরেই ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিদেশে প্রসারলাভ করেছিল।

## সামাজিক অবস্থা

গুপ্তযুগে হিন্দুসমাজ চারটি বর্ণ বা শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল, যথা-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র। 'চতুরাশ্রম' প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল যথা, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গাহস্থ্যাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাস বা যতি-আশ্রম। রাজা ছিলেন প্রধান সমাজপতি। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সংমিশ্রণ (বর্ণ-সংকর) প্রতিরোধ করা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অন্যতম কর্তব্য বলে বিবেচিত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

## ব্রাহ্মণদের অবস্থান

সমাজজীবনে ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল শীর্ষে এবং তাঁদের কর্তব্য ও আদর্শ সুনির্দিষ্ট ছিল। পূজা-পার্বণ, তপস্যা ও বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার ব্যাপারেই তাঁরা সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন। ব্রাহ্মণদের অর্থ ও সম্পত্তি দান করার প্রথা সেই যুগে ব্যাপক প্রচলিত ছিল। জৈন সামন্ত ও নৃপতিরাও ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতেন। রাজপরিবারেও ব্রাহ্মণ-আচার্যরা নিযুক্ত হতেন। এই যুগে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও গ্রন্থকারদেরও বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

## বিবাহ

সমাজে বর্ণভেদ প্রথা কঠোর হলেও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। বহুবিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। গুপ্তরাজপরিবারে বহুবিবাহের উল্লেখ আছে। অবশ্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে একমাত্র রাজার প্রধান মহিষী অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেতেন।

## নারীসমাজ

সে যুগে স্ত্রীধনেরও উল্লেখ পাওয়া যায় এবং নারীরা ইচ্ছেমত দান করতে পারতেন। সমাজে সতীপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং নারীশিক্ষারও বহুল প্রচলন ছিল। নারীশিক্ষার জন্য শিক্ষায়তনের উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরাই উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করত। নারী স্বাধীনতা সেই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

## বিলাসিতা

বিত্তশালীরা বিলাসিতায় দিন কাটাত। তারা সুরম্য অট্টালিকায় বাস করত এবং এদের মধ্যে মদের বহুল প্রচলন ছিল। মাদকদ্রব্য সেবন মোটেই নিন্দনীয় ছিল না। 'কথাসরিৎসাগর' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, নারীরাও মদ্য সেবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল না।[১১]

## সাহিত্যঃ পেরিক্লিস ও এলিজাবেথের যুগের সঙ্গে গুপ্তযুগের তুলনা

গুপ্তযুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অপূর্ব বিকাশ ঘটে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে বিচার করে বার্নেট গুপ্তযুগকে গ্রিসের পেরিক্লিসের যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে স্মিথ গুপ্তযুগকে ইংল্যান্ডের এলিজাবেথ ও স্টুয়ার্ট যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্মিথের মতে সেক্সপীয়রের মনীষা যেমন ইংল্যান্ডের অপরাপর সাহিত্যসেবীদের প্রতিভা ম্লান করেছিল, তেমনি ভারতে কালিদাসের প্রতিভার কাছে অন্যেরা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু স্মিথের এইরূপ মন্তব্য যথার্থ বলে স্বীকার করা যায় না। সেক্সপীয়রের আবির্ভাব না হলেও এলিজাবেথ যুগের সাহিত্য গৌরব অর্জন করত। ভারতেও কালিদাস ভিন্ন অনেক প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যসেবীদের অবদানে ভারতের সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল, এতে সন্দেহ নেই।[১২]

## গুপ্তরাজাদের বিদ্যোৎসাহিতা

গুপ্তসম্রাটদের অনেকেই বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতির পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত কেবল শিক্ষার পৃষ্টপোষকই ছিলেন তা নয়, তিনি নিজেও একজন প্রতিভাবান কবি ছিলেন। যদি কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন হন, তা হলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বলা যেতে পারে। স্মিথের মতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতের ভাব-আদর্শের বিনিময়ের ফলেই ভারতীয় মনীষার এক অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। [১৩]

## সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রচলন

গুপ্তযুগে সংস্কৃত ভাষা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। কিন্তু তাই বলে একথা বলা যায় না যে, এই যুগে সংস্কৃত ভাষার পুনরভ্যুদয় ঘটে। বস্তুত গুপ্তপূর্ব যুগে সংস্কৃত ভাষা কখনই বিস্মৃত বা অবহেলিত হয় নি। মৌর্যযুগে সংস্কৃত ভাষা রাষ্ট্রভাষা ছিল না বটে, কিন্তু তাই বলে এই ভাষার ব্যবহার অপ্রচলিতও ছিল না। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সময় রচিত পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য', রুদ্রদমনের বিখ্যাত 'জুনাগড়-শিলালিপি', অশ্বঘোষ ও চরক রচিত গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষাতেই লেখা হয়। সুতরাং গুপ্তযুগের অনেক আগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভ করে। গুপ্তরাজারা ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এর অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। এ যুগের অধিকাংশ লিপি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। হরিষেণ কর্তৃক রচিত' এলাহাবাদ-প্রশস্তি' সুললিত কাব্যের মতো শ্রুতিমধুর। কাব্যের এরকম ভাষা বহুকালের সাধনার ফল। সুতরাং আকস্মিকভাবে এই ভাষার উন্নতি হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

এ যুগে 'মহাভারত' ও পুরাণগুলির সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন হয়। এর ফলে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধিত হয়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই 'মহাভারতে'র কাহিনী প্রচলিত ছিল। খ্রিষ্টের জন্মের পূর্বেই 'ধর্মশাস্ত্র', 'পুরাণ' লেখকদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু গুপ্তযুগে 'মহাভারত' ও পুরাণগুলির সম্পাদনা এমনভাবে করা হয় যা এক সম্পূর্ণ নতুন সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করে। হিন্দুদের কাছে 'মহাভারতে'র গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কারণ তা ভারতবাসীর জাতীয় ঐতিহ্য, ধর্ম এবং রাজনৈতিক ও নৈতিক বোধের এক বিশাল ভাণ্ডার। পূর্ববর্তী যুগে কৃত 'মহাভারতে'র ভাষ্য এখন প্রায় অজ্ঞাত এবং 'পুরাণ' সম্পর্কেও সে কথা বলা চলে। জাতীয় স্বার্থে গুপ্তযুগে 'ভাগবত', 'স্কন্দ', 'মৎস্য', 'বায়ু' ও 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ' নতুন করে রচিত হয়। অনেকের মতে 'মহাভারত' ও পুরাণগুলির নব-সম্পাদনা ও রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তসাধন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করা। কিন্তু এ ধরনের ভাবনা-চিন্তা অসার বলে মনে হয়। কারণ গুপ্তযুগেই সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটে এবং 'বুদ্ধচরিত', 'সৌন্দরানন্দ' প্রভৃতি বৌদ্ধ কাব্যগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ যুগেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব ভারতের সর্বত্র বিস্তারলাভ করে। একথাও মনে রাখা দরকার যে, গুপ্তযুগের পরেও প্রায় চারশ বছর ধরে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন ছিল এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ মঠ প্রভৃতির প্রতি আপামর জনগণের যথার্থ শ্রদ্ধা ছিল। সুতরাং 'মহাভারত' ও 'পুরাণ'গুলির নব কলেবরে সম্পাদনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জীবন থেকে কুষাণ, গ্রিক, পহ্লব প্রভৃতি বিদেশী জাতিগুলির প্রভাব দূর করা এবং জাতীয়তাবোধ সঞ্চারে গুপ্ত সম্রাটদের কালজয়ী অবদান সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করা।

গুপ্তযুগে বহুসংখ্যক খ্যাতনামা সাহিত্যিক, কবি ও দার্শনিকদের 'আত্মপ্রকাশ ঘটে। এদের মধ্যে কালিদাস ছিলেন অন্যতম। কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তল', 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব', ঋতুসংহার, 'মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রভৃতি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে কালিদাসের প্রতিভার চরম প্রকাশ ঘটে। 'মৃচ্ছকটিক' গ্রন্থের রচয়িতা শূদ্রক সম্ভবত খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকে জীবিত ছিলেন। 'মৃচ্ছকটিক' প্রকরণও সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি অমূল্য গ্রন্থ। বিশাখদত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক ও বিষ্ণুশর্মা রচিত পঞ্চতন্ত্রও এ যুগের অপর মূল্যবান গল্পগ্রন্থ। 'মুদ্রারাক্ষস' থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক মগধের সিংহাসনলাভের বিবরণ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি প্রমুখ মনীষীদের রচিত স্মৃতিশাস্ত্রলিও এই যুগে রচিত হয়। কামন্দকের নীতিসার সম্ভবত গুপ্তরাজাদের এক মন্ত্রী কর্তৃক রচিত হয়। এই যুগেই বৌদ্ধায়ন, উপবর্ষ, ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রমুখ খ্যাতনামা দার্শনিকরা তাঁদের বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থগুলি রচনা করেন। বৌদ্ধ দার্শনিকরাও শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। বসুবন্ধু রচিত 'হীনযান' ও 'মহাযান' বৌদ্ধ গ্রন্থ, প্রমথ রচিত 'বসুবন্ধুর জীবনী', চন্দ্রগোমীন রচিত 'চান্দ্রব্যাকরণ' প্রভৃতি এই যুগের উল্লেখযোগ্য রচনা। এই যুগের অপর খ্যাতনামা গ্রন্থকার ছিলেন 'এলাহাবাদ প্রশস্তির' রচয়িতা ও সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ। হরিষেণ ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের সেনাপতি ও পররাষ্ট্র-মন্ত্রী।

এই যুগেই সাংখ্যদর্শনের নবরূপায়ণ ঘটে। ভার্যগগণ্য ও ঈশ্বরকৃষ্ণের মূল্যবান টীকা এই যুগেই রচিত হয়। সুতরাং দর্শন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও গুপ্তযুগ ছিল সমৃদ্ধ।

## বিজ্ঞান

সাহিত্য ছাড়াও জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ন প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানেও ভারতীয় মনীষার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। আর্যভট্ট ও বরাহমিহির ছিলেন এই যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। আর্যভট্ট রচিত 'সূর্য সিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের মনোরম বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি গ্রহ উপগ্রহগুলির অবস্থিতি সম্পর্কেও মনোজ্ঞ বিবরণ রেখে গেছেন। বরাহমিহির রচিত 'বৃহৎসংহিতা' ও 'পঞ্চসিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থে গ্রিক ও রোমান জ্যোতিষশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এইরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে, ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ রোমান ও গ্রিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রেরও এইযুগে যথেষ্ট প্রসার ঘটে। সম্ভবত শল্যচিকিৎসাও এযুগে প্রচলিত ছিল এবং অনেকের মতে শল্যবিদ্যায় পারদর্শী শুশ্রুত গুপ্তযুগেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

## শিল্পকলা

### স্থাপত্যশিল্প

গুপ্তযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে। এই যুগে মথুরা, বারাণসী ও পাটলিপুত্র শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র ছিল। গুপ্তযুগের শিল্পকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সহজ ও স্বাভাবিক গড়ন এবং সৌন্দর্যের প্রকাশ। মূর্তিগুলির সাবলীল অঙ্গবিন্যাস, নিখুঁত সম্পাদনা ও বাস্তবের ভিত্তির ওপর অতীন্দ্রিয় রসসৃষ্টি গুপ্তযুগের শিল্পকলাকে এক অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় ঘটনাবলিকে অবলম্বন করে ভাস্কররা তাঁদের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

এযুগের শিল্পকলার বহু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মুসলমান আক্রমণের ফলে বিধ্বস্ত হওয়ায় এগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। এই যুগের আবিষ্কৃত স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন হল তিগোয়ার বিষ্ণুমন্দির (জবলপুর), ভুমারের শিব মন্দির, কুবীরের পার্বতীমন্দির (ভূতপূর্ব অজয়গড় রাজ্য), সাঁচী ও বোধগয়ার বৌদ্ধ স্তূপ, দেওগড়ের (ঝাঁসী) প্রস্তরনির্মিত দশাবতার মন্দির, ভিতরগাঁওয়ের (কানপুর) ইষ্টকনির্মিত মন্দির। ভিতরগাঁওয়ের মন্দিরটির গড়ন ছিল পিরামিডের মতো। এর দেওয়ালগুলি অলংকারখচিত এবং পৌরাণিক আখ্যানক্ষোদিত। দেওগড়ের প্রস্তরনির্মিত মন্দির ছাড়া অপরাপর প্রস্তরনির্মিত মন্দিরগুলি আকারে ছোট এবং এগুলিতে মূর্তি উপবিষ্ট থাকলেও পূজার জন্য মন্দিরগুলি ব্যবহৃত হতো না। এই মন্দিরগুলির ছাদ সাধারণত প্রশস্ত। বিখ্যাত শিল্প-বিশেষজ্ঞ পাসীব্রাউন (Pasy Brown) দেওগড়ের দশাবতার মন্দিরটিকে গুপ্তযুগের স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৪]

## ভাস্কর্যশিল্প

ভাস্কর্যশিল্পের ক্ষেত্রেও অভাবনীয় উন্নতি লক্ষ করা যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের আদর্শ নীতি ও ধর্মসম্বন্ধীয় ঘটনাবলিকে অবলম্বন করে ভাস্কররা শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। সারনাথে প্রাপ্ত ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ, মথুরায় দণ্ডায়মান বুদ্ধ, সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত বুদ্ধের তাম্রমূর্তি বৌদ্ধ ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভারতের কতগুলি শ্রেষ্ঠ শিবমূর্তি গুপ্তযুগেই নির্মিত হয়েছিল। কুষাণ আমলে শিবলিঙ্গ পূজার প্রচলন ছিল। একমুখী ও চতুর্মুখী শিবলিঙ্গের নির্মাণ এ যুগেই প্রথম প্রচলিত হয়। পৌরাণিক আখ্যান ও উপাখ্যান অবলম্বনে রাম, কৃষ্ণ, শিব প্রভৃতি দেবতার মূর্তি গঠন এই যুগের ভাস্কর্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মূর্তিগুলির সাবলীল অঙ্গবিন্যাস ও রেখার সুস্পষ্টতা অপূর্ব। ডক্টর মজুমদারের মতে, “Indeed the Gupta sculpture may be regarded a typically Indian and classic in every sense of the term.”[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

## চিত্রশিল্প

গুপ্তযুগে চিত্রশিল্পেরও অপূর্ব বিকাশ ঘটে। পাহাড় কেটে গুহামন্দির নির্মাণ ও মন্দিরের দেওয়ালগাত্রে অঙ্কিত চিত্র সে যুগের চিত্রশিল্পের চরম উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। অজন্তার গুহাচিত্রের অধিকাংশই এই যুগের সৃষ্টি এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে এই চিত্রগুলি রেনেসাঁস যুগের ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রাচীরচিত্রগুলির সমতুল্য। গুহাচিত্রগুলি বাস্তবতায় পরিপূর্ণ এবং এগুলিতে সমাজের প্রতিটি শ্রেণির নর-নারীর জীবনের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত রয়েছে।

বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে বহু চিত্রাকর্ষক চিত্রও অঙ্কিত হয়। অজন্তার ষোড়শ ও সপ্তদশ (Cave XVI and XVII) গুহাগুলি মনোরম চিত্রে পরিপূর্ণ।

## বাঘগুহাচিত্র

মালবের বাঘগুহার প্রাচীরচিত্রগুলিও অজন্তার গুহাচিত্রের সমকক্ষ। পরিকল্পনায়, বর্ণসুষমায় ও বাস্তবতায় বাঘগুহার চিত্রগুলি অতুলনীয়। এইযুগে ধাতবশিল্পেরও অসামান্য বিকাশ ঘটে। দিল্লির কুতুবমিনারের কাছের চন্দ্ররাজের লৌহস্তম্ভ এই যুগের ধাতবশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দেড়হাজার বছর পরে সূর্যতাপ ও বারিপাতেও এই স্তম্ভে এখনও মরিচা পড়ে নি এবং এর মসৃণতাও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় নি। এই যুগে অসংখ্য ব্রোঞ্জ ও তাম্র মূর্তি নির্মিত হয়। নালন্দায় প্রাপ্ত বুদ্ধের তাম্রমূর্তি ও সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত বুদ্ধের অপর একটি মূর্তি এই যুগের ধাতব শিল্পোন্নতির অপর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

## ধর্ম

### গুপ্ত সম্রাটদের ব্যক্তিগত ধর্ম

গুপ্তযুগে ধর্মের ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি লক্ষ করা যায়। অনেকের মতে গুপ্তরাজারা ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। এর সমর্থনে বহু যুক্তির অবতারণাও করা হয়েছে। গুপ্তরাজারা নিজেদের 'পরমভাগবত' বলে অভিহিত করতেন। এতে অনুমিত হয় গুপ্তরাজারা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। গুপ্তরাজাদের মুদ্রায় বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীর প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত দেখা যায়। গুপ্তমুদ্রায় বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের প্রতিচ্ছবিও অঙ্কিত দেখা যায়। স্কন্দগুপ্তের 'জুনাগড়লিপিতে' বিষ্ণুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের উল্লেখ আছে। এর থেকে মনে হয় স্কন্দগুপ্তও বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু উপর্যুক্ত মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। ভগবান বলতে কোনো একটি বিশিষ্ট দেবতাকে বোঝায় না। গুপ্তমুদ্রায় যেমন বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত দেখা যায়, তেমন কতগুলি মুদ্রায় শিবের বাহন বৃষের প্রতিচ্ছবিও অঙ্কিত দেখা যায়। সুতরাং গুপ্তরাজারা শুধু যে বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এমন মনে হয় না। তাঁরা শিবের উপাসনাও করতেন এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। আবার কতকগুলি মুদ্রায় ও লিপিতে পার্বতী, কার্তিকেয় প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রতিও গুপ্তরাজাদের শ্রদ্ধাঞ্জলির উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেব-দেবীর উল্লেখ থেকে মনে হয় যে, তাঁরা এক এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এক এক দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতেন। এককথায় গুপ্তরাজারা ছিলেন হিন্দুধর্মী এবং বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবীর উপাসক।

## বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার প্রচলন

গুপ্তশাসনকালে বৈদিক যুগের দেব-দেবীর স্থলে পৌরাণিক বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সূর্য প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত হয়। এই যুগে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের ভক্তিমূলক ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। হিন্দুসমাজে 'শৈবধর্ম' ও 'ভাগবতধর্ম' দুটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। পাশাপাশি শিব ও বিষ্ণু মন্দির নির্মাণের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। শিবপূজার সঙ্গে সঙ্গে শিবের মহিষী পার্বতীর পূজারও প্রচলন ছিল। সেই যুগে শক্তিপূজাও প্রচলিত ছিল। মহিষাসুরমর্দিনীর বহু মূর্তি গুপ্ত সাম্রাজ্যের নানা স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। যুদ্ধযাত্রাকালে গুপ্তারাজারা শক্তিপূজা করতেন, এরূপ বহু উল্লেখ আছে।

## হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রচলন

গুপ্তযুগে হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও প্রচলিত ছিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম উত্তরোত্তর প্রাধান্য পেতে থাকে। উচ্চবর্ণের লোকেরা ছিল বৌদ্ধধর্মী। জৈন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। গুপ্তসম্রাটরা ছিলেন হিন্দুধর্মানুরাগী ও এর পৃষ্ঠপোষক। গুপ্ত সম্রাটদের অনেকেই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মও এই যুগেই জনপ্রিয় ছিল। ফা-হিয়েনের বিবরণীতে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারে বৌদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধগ্রন্থকারদের অবদান অস্বীকার করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

### মধ্য দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবহ্রাস

এই যুগের বহু খ্যাতনামা বৌদ্ধ মনীষীদের আবির্ভাব হয়েছিল এবং সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। নানার্জুন, বসুবন্ধু, পরমার্থ প্রমুখ বৌদ্ধমনীষীদের আবির্ভাব এই যুগেই হয়েছিল। বৌদ্ধমঠগুলি ছিল যুগের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র।

দৃষ্টান্তস্বরূপ নালন্দার উল্লেখ করা যায় অবশ্য মধ্য দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং পরিশেষে তা হিন্দুধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে পড়ে।

### ধর্মক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা

ধর্মীয় উদারতা ও পরধর্মসহিষ্ণুতা ছিল এই যুগের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। গুপ্তরাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হয়েও তাঁরা পরধর্মের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন এবং শাসনকার্যে পরধর্মে বিশ্বাসী লোককেও নিযুক্ত করতেন। ফা-হিয়েনের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় ছিল। এই যুগে ধর্মবিরোধী কোনো উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় নি। বস্তুত শিক্ষাকেন্দ্রগুলির জনপ্রিয়তা, বহু  বৌদ্ধ মনীষীদের আবির্ভাব, বহু বৌদ্ধ গ্রন্থাদির রচনা সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে শান্তির ইঙ্গিত বহন করে।

গুপ্তযুগের সার্বিক অগ্রগতি দেখে এই যুগকে সুবর্ণযুগ বলা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা সমাজের উচ্চকোটির মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই অনেক ক্ষেত্রে সুবর্ণযুগের ধারণা কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়।

## ষষ্ঠ শতক

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর মৌখরীরা গয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজত্ব শুরু করেন। লিপি ও সাহিত্যে এই মৌখরীদের দুটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। যার মধ্যে প্রথম শাখাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যজ্ঞবর্মণ এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা ছিলেন শার্দূলবর্মণ ও অনন্তবর্মণ। অপরদিকে দ্বিতীয় শাখাটির নৃপতিরা ছিলেন হরিবর্মণ, আদিত্যবর্মণ, ঈশ্বরবর্মণ, ঈশানবর্মণ, অবন্তিবর্মণ ও গ্রহবর্মণ। মৌখরীলিপিতে যজ্ঞবর্মণ, শার্দূলবর্মণ ও অনন্তবর্মণকে রাজা বা মহারাজ বলে উল্লেখ করা হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা সামন্ত বা সামন্ত চূড়ামণি বলে অভিহিত হয়েছেন। সম্ভবত তাঁরা ছিলেন গুপ্ত-সম্রাটদের অধীনস্ত সামন্ত। মৌখরীদের নতুন রাজবংশের প্রথম রাজা ছিলেন হরিবর্মণ। তাঁর উপাধি ছিল 'মহারাজ'। লিপি থেকে তাঁর রাজ্য বিস্তারের বর্ণনা পাওয়া যায়। 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে মৌখরী ও গুপ্তরাজাদের মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। আদিত্যবর্মণের পর তাঁর পুত্র ঈশ্বরবর্মণ সিংহাসনে আরোহণ করেন, সম্ভবত তিনি ৫৫৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজত্ব করতেন। জৌনপুর প্রস্তরলিপি থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বরবর্মণ উত্তর ভারতে অন্ধ্রদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন।[১৬]

'অসিরগড়লিপি' থেকে জানা যায় যে, তিনি মগধের গুপ্ত রাজকন্যা দেবী উপগুপ্তাকে বিয়ে করেন। ঈশ্বরবর্মণের পর তাঁর পুত্র ঈশানবর্মণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মৌখরীরাজাদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালেই মৌখরী রাজবংশ শক্তি ও মর্যাদার চরম শিখরে উঠেছিল। তিনি অন্ধ্র, শুলিক, ও গৌড়বাসীদের পরাজিত করে রাজত্বসূচক উপাধি গ্রহণ করেন। ঈশানবর্মণের শাসনাধীনে মৌখরী রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানা যায় না। মুদ্রা ও অনুশাসন লিপির প্রাপ্তিস্থান থেকে মনে হয় যে, সমগ্র উত্তর প্রদেশ, মগধের কতকাংশ ও দাক্ষিণাত্যের কতকাংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঈশান বর্মণ এবং তাঁর পরবর্তী দুজন রাজা, সর্ববর্মণ ও অবন্তিবর্মণ যথাক্রমে ৫৭৬ থেকে ৫৮০ এবং ৫৮০ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অবন্তিবর্মণের পর গ্রহবর্মণ (৬০০-৬০৬) খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তীতে যুধগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্তসাম্রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা দেখা দিলে যশোধর্মণ নামে এক ব্যক্তি মালবে একটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। হুনরাজ মিহিরকুলকে পরাজিত করে তিনি পরাক্রান্ত নরপতিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সম্ভবত তিনি মালবের কোনো সামন্ত বংশসম্ভূত ছিলেন। মন্দাশোরে প্রাপ্ত একটি অনুশাসনলিপি থেকে জানা যায় যে, যশোধর্মণের রাজ্য ব্রহ্মপুত্র থেকে আরবসাগর ও হিমালয় থেকে পূর্বঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীকালের গুপ্তরাজ আদিত্য গুপ্তবংশীয় রাজাদের পরিচয় পাওয়া যায়। এ ইতিহাসের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল অযোধ্যা ও গয়ার মৌখরীদের সঙ্গে অবিরত সংঘর্ষের ইতিহাস, মালবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কৃষ্ণগুপ্ত। সম্ভবত, তিনি ৫১০ খ্রিষ্টাব্দে এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পরবর্তী দুই রাজা হর্ষগুপ্ত ও জীবগুপ্তের সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি। তৃতীয় কুমারগুপ্ত ছিলেন এই বংশের চতুর্থ রাজা এবং মৌখরীরাজ ঈশানবর্মণের সমসাময়িক।

Dhaka University Institutional Repository

কুমারগুপ্তকে অন্ধ্র, শুলিক ও গৌড়বাসীদের সঙ্গে একাধিকার যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। কিন্তু তার অন্যতম শত্রু ছিল ঈশানবর্মণ। প্রথমদিকে মালবের গুপ্তবংশ ও মৌখরীদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। কিন্তু ঈশানবর্মণ রাজত্বসূচক উপাধি ধারণ করলে এই দুই বংশের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। এই সংঘর্ষ চলে প্রায় হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল পর্যন্ত।

মালবের গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন আদিত্যসেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে অরাজকতার সুযোগ নিয়ে তিনি নিজরাজ্য বিস্তার করেন। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি গৌড় ও মৌখরীরাজ্যের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করেন এবং এক মৌখরীরাজের সঙ্গে নিজ কন্যার বিয়ে দেন। সাহাপুর শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি ৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আর এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় জীবগুপ্ত। তিনি অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজত্ব করেন। অবশেষে গৌড় রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে মালবের গুপ্তবংশের অবসান ঘটে।

মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত বকাটকবংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমসাময়িক কালে স্থাপিত হয়। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে যে সকল রাজবংশের উৎপত্তি হয়েছিল তার মধ্যে বকাটকবংশ ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। এই বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। ডক্টর জয়স্বাল উত্তর ভারতে প্রাপ্ত বকাটক রাজ প্রথম প্রবরসেনের নামাঙ্কিত মুদ্রার ওপর ভিত্তি করে বলেন যে, বকাটকরা ছিলেন উত্তর ভারতীয়। কিন্তু জয়স্বালের এই অনুমান যথার্থ বলে মনে হয় না। কারণ বকাটকরাজারা কখনও তাঁদের নিজস্ব মুদ্রার প্রচলন করেন নি এবং তাঁদের রাজ্যের সর্বত্র গুপ্তরাজাদের মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। অনেকে আবার মনে করেন যে, বকাটকরা ছিল দক্ষিণ ভারতীয়। কেননা দক্ষিণ ভারতের পল্লববংশের অনুশাসনলিপি ও বকাটকবংশের অনুশাসনলিপির মধ্যে বহু সাদৃশ্য দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য বংশের মতো বকাটকরাও 'ধর্মমহারাজ' উপাধি ধারণ করেন। সুতরাং এই সকল সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে মনে করা হয় যে, বকাটকরা ছিল দক্ষিণ ভারতীয়।

এই বকাটকবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিন্ধ্যশক্তি। এই বংশের অনুশাসন লিপিতে তাঁকে 'বকাটক বংশকেতু' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিন্ধ্যশক্তির পর তাঁর পুত্র প্রথম প্রবর সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার রাজধানী ছিল পুরীক। সম্ভবত তিনি পুরীকের নাগরাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর রাজ্য বকাটক রাজ্যভুক্ত করেন। প্রথম প্রবরসেনের পর প্রথম রুদ্রসেন, পৃথিবীসেন, দ্বিতীয় রুদ্রসেন ও দিবাকরসেন যথাক্রমে রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রসেনের সঙ্গে গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজ কন্যা প্রভাবতীর বিয়ে দেন।

এই বকাটক গুপ্তমৈত্রী পশ্চিম ভারতে শক ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে কলচুরি নামে এক দক্ষিণ ভারতীয় বংশের কাছে বকাটক বংশের অবসান ঘটে।

দক্ষিণ ভারতের ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে বকাটকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বকাটকরা ছিল গোঁড়া হিন্দু। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল শিবের উপাসক। একমাত্র রুদ্র সেন ছিল বিষ্ণুর উপাসক। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করে তাঁরা বহু যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

বকাটকরাজারা সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং এদের অনেকেই লেখকরূপে খ্যাতি লাভ করেন। বকাটকরাজ সর্বসেন ছিলেন হরিবিজয় নামে একখানি প্রাকৃত কাব্যের রচয়িতা। তার রাজধানী ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র। দ্বিতীয় প্রবরসেনও প্রাকৃত ভাষায় বহু কাব্য রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে 'সেতুবন্ধন' নামক কাব্যটি সুধীসমাজে সমাদৃত হয়। অনেকের মতে কালিদাস দ্বিতীয় প্রবর সেনের রাজসভায় কিছুকাল অতিবাহিত করে তাঁর বিখ্যাত 'মেঘদূত' কাব্যটি রচনা করেন।

বকাটকরাজারা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পকলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রসঙ্গত তিয়োগের মন্দিরটি উল্লেখ করা যায়। এই মন্দিরে সংরক্ষিত গঙ্গাযমুনার মূর্তি ভাস্কর্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। অজন্তার ষষ্ঠ ও সপ্তম বিহারগুলি ও ঊনবিংশ চৈত্যগুহা এই যুগেই নির্মিত হয়েছিল। উপর্যুক্ত বিহারের গুহা দুটিকে ফারগুসন (Fergusson) ভারতের অন্যতম বৌদ্ধ শিল্প নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ শতকে স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলো আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রেরও পত্তন হয়।

বস্তুত স্বাধীন রাজাদের রাষ্ট্রযন্ত্র গুপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের অনুকরণই বলা যায়। রাষ্ট্রবিভাগ, শাসন পদ্ধতি, রাজপাদোপজীবীদের উপাধি, দায় ও অধিকার, শাসনক্রম, ইত্যাদি সমস্ত কিছুই তৎকালীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে লক্ষ্যণীয় ছিল। তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজরাজারা বিভিন্ন উপাধি ব্যবহার করেছেন। বপ্পখোষবাট লিপিতে জয়নাগ এবং শশাঙ্কের একাধিক লিপিতে গৌড় কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কও 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিতেই আখ্যাত হয়েছেন। খড়গবংশের প্রতিষ্ঠাতা খড়্গোদ্যাম নৃপতিরাজ এবং ত্রিপুরার লোকনাথ পট্টোলীর সামন্ত শিবনাথের পিতা, লোকনাথের বংশের প্রতিষ্ঠাতা অধিমহারাজ আখ্যায় পরিচিত হয়েছেন। এরা সকলেই স্বাধীন নরপতি ছিলেন সন্দেহ নেই, এবং সেই হিসেবেই তারা 'মহারাজাধিরাজ', 'নৃপাধিরাজ', 'অধিমহারাজ' প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করেছেন।

এ যুগের রাজতন্ত্র ছিল সামন্ততন্ত্র নির্ভর। এ ষষ্ঠ শতকে সমাজের ভূমিনির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। বপ্পঘোষবাট লিপির মাধ্যমে জানা যায় যে, সামন্ত নারায়ণভদ্র ঔদুম্বরিক 'মহারাজাধিরাজ' জয়নাগের সামন্ত ছিলেন। লোকনাথ পট্টোলী কথিত ব্রাহ্মণ প্রদোষশর্মা মহারাজ লোকনাথের মহাসামন্ত ছিলেন। আস্রফপুর লিপিতে জনৈক সামন্ত বনটিয়োকের সাক্ষাৎ পাই। শশাঙ্ক তাঁর রাষ্ট্রীয় জীবন আরম্ভই করেছিলেন মহাসামন্তরূপে তারপর যখন তিনি স্বাধীন পরাক্রান্ত নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তার নিজেরও মহাসামন্ত ছিল। বিজিত রাজ্যের রাজারাই বিজেতা 'মহারাজাধিরাজ' কর্তৃক মহাসামন্তরূপে স্বীকৃত হতেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। শৈলোদ্ভব বংশীয় কঙ্গোদাধিপতি দ্বিতীয় মাধবরাজ এবং দণ্ডভুক্তির শাসনকর্তা সোমদও এই দুজনই যথাক্রমে শশাঙ্কের 'মহারাজ' 'মহাসামন্ত' এবং 'সামন্তমহারাজ' ছিলেন। সামন্তরা সকলে যে একই পর্যায় ও মর্যাদাভুক্ত ছিলেন না, তা তাদের উপাধি হতেই সুপ্রমাণিত। কেননা কারো উপাধি ছিল মহাসামন্ত মহারাজ, কারো উপাধি মহাসামন্ত, আবার কারো উপাধি ছিল শুধু সামন্ত। ভূম্যধিপত্যের বিস্তৃতি, রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা ও অধিকার, রাজসভায় ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি প্রভৃতির উপর এই স্তরবিভাগ নির্ভর করত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

## সপ্তম শতক

সপ্তম শতকের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা জানতে পারি হিউয়েন সাং ও ইৎ সিং-এর বিবরণী থেকে।

হিউয়েন সাং তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে অত্যন্ত নিপুণভাবে সপ্তম শতকের ইতিহাসের উপাদানের বর্ণনা করেছেন।

হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণবৃত্তান্তের মূল বক্তব্য নিম্নে বর্ণিত হলো-

প্রায় আট বছর (৬৩৫-৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) হিউয়েন সাং হর্ষবর্ধনের অনুগ্রহ ও সখ্যতা লাভ করেন। সুতরাং হর্ষবর্ধন সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জনের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। হিউয়েন সাং হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। রাজা নিজে রাজ্যমধ্যে পরিভ্রমণ করে শাসনসংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করতেন। শাসনকার্য ছিল রাজার ব্যক্তিগত ব্যাপার। মৌর্যসম্রাটদের মতো হর্ষবর্ধনের শাসনপ্রণালী আমলাতান্ত্রিক ছিল না। গুপ্তসম্রাটদের মতো হর্ষবর্ধনেরও একটি মন্ত্রিপরিষদ ছিল। প্রদেশগুলি সাধারণত অনুগত সামন্তগণ কর্তৃক শাসিত হতো। হিউয়েন সাং হর্ষবর্ধনের রাজকর্তব্যবোধের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

হর্ষবর্ধনের এক বিশাল সেনাবাহিনী ছিল। হিউয়েন সাং-এর বর্ণনা অনুসারে হর্ষবর্ধনের পদাতিক, অশ্ববাহিনী ও হস্তীবাহিনীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫০ হাজার, এক লক্ষ ও ৬০ হাজার। সেনাবাহিনী ছিল সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত। সীমান্তরক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত ছিল। রাজপ্রাসাদ ছিল সুরক্ষিত।

ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য করের পরিমাণ ছিল নিতান্তই সামান্য। উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ রাজস্বরূপে নেওয়া হতো। বিনা পারিশ্রমিকে কাউকেই বেগার খাটান হতো না । রাজার নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি চারভাগে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি ভাগের আয় থেকে নির্দিষ্ট শুল্ক আদায় করা হতো। বণিকরা যাতে রাজকর্মচারীগণ কর্তৃক অনর্থক উৎপীড়িত না হয় সেদিকে রাজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

হর্ষবর্ধন ছিলেন বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্যসেবীদের পৃষ্ঠপোষক। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সে যুগের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র এবং হর্ষবর্ধন এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

সে যুগে ধর্মীয় শিক্ষার চল ছিল বেশি। বৌদ্ধমঠগুলি ছিল প্রধানত ধর্মীয় শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। সাধারণ লোকের ভাষা ছিল ব্রাহ্মী। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বহুল প্রচলন ছিল। নয় থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যার্জনের রীতি প্রচলিত ছিল। ত্রিশ বছর অতিক্রম করে বিদ্যার্থীরা কর্মজীবনে প্রবেশ করত।

গুপ্তযুগের তুলনায় হর্ষবর্ধনের আমলে দণ্ডবিধি কঠোর ছিল। দণ্ডবিধির কঠোরতা সত্ত্বেও দেশে দস্যু-তস্করের উপদ্রব অব্যাহত ছিল। হিউয়েন সাং নিজেই একাধিকবার দস্যু কর্তৃক নিগৃহীত হয়ে সর্বস্ব হারান।

হিউয়েন সাং-এর সময় ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পায় এবং হিন্দুধর্ম ধীরে ধীরে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। হর্ষবর্ধন সকল ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল। জৈনধর্ম একমাত্র উত্তর-বিহার এবং উত্তর ও পূর্ব বঙ্গেই জনপ্রিয় ছিল।

হিউয়েন সাং হর্ষবর্ধন কর্তৃক কনৌজে আহূত ধর্মসভা ও প্রয়াগের ধর্মসভার মনোজ্ঞ বিবরণ তুলে ধরেছেন। ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন কনৌজে এক ধর্মসভার আয়োজন করেন। বহু সহস্র বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতও এতে যোগদান করেন। এ ছাড়া বহু সহস্র দর্শক ও ৮০ জন সামন্ত-নরপতি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বর্ণনির্মিত বুদ্ধমূর্তি সহ পাঁচশত সুসজ্জিত হাতির একটি বিরাট শোভাযাত্রা বের হতো। হর্ষবর্ধন চামরহাতে বুদ্ধমূর্তির পশ্চাতে উপবিষ্ট থাকতেন। শোভাযাত্রাটি নগরের বাইরে একটি নবনির্মিত মন্দিরের সামনে এসে শেষ হতো এবং বুদ্ধের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদিত হতো। প্রতিদিন হর্ষবর্ধন ধনরত্ন বিতরণ করতেন। আঠারো দিন ব্যাপী ধর্মসভার অধিবেশন চলত। কথিত আছে বৌদ্ধধর্মের প্রতি হর্ষবর্ধনের অনুরাগে রুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণরা তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রায় পাঁচশত ব্রাহ্মণকে বন্দী করা হলে তাঁরা নিজেদের দোষ স্বীকার করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আবার অনেকেই নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

কনৌজের ধর্মসভার পর হর্ষবর্ধন হিউয়েন সাংকে সঙ্গে নিয়ে প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিক মেলায় গেলেন। প্রয়াগের মেলা 'মহামোক্ষক্ষেত্র' নামে পরিচিত ছিল। তিনমাস ধরে প্রয়াগের ধর্মমেলার উৎসবানুষ্ঠান চলত। এখানে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশ হতো। এ ছাড়া কুড়িটি রাজ্যের নৃপতিরাও এতে যোগদান করতেন। উৎসবের প্রথম দিনে একটি অস্থায়ী মন্দিরে বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন করা হতো এবং বহু মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ দর্শকদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে যথাক্রমে সূর্য ও মহেশ্বরের মূর্তি স্থাপন করে, তাদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করা হতো এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ধনরত্ন ও বস্ত্রাদি দান করা হতো।

প্রতিটি ভিক্ষুক একশত স্বর্ণমুদ্রা ও বস্ত্রাদি পেতেন। এর পর কুড়ি দিন ধরে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ধনরত্ন ও বস্ত্রাদি বিতরণ করা হতো। এরপর দেড়মাস ধরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত দরিদ্র ও অনাথদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী ও অর্থ দান করা হতো। হিউয়েন সাং-এর কথায় 'এইভাবে তিনমাসের মধ্যে একমাত্র অশ্ব, হস্তী ও সামরিক উপকরণ ছাড়া রাজ্যের রাজকোষ ও রাজার পাঁচ বছরের সঞ্চিত অর্থাদি নিঃশেষ হয়ে যায়।' কথিত আছে যে, সর্বস্ব দানের পর হর্ষবর্ধন ভগিনী রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে একখণ্ড বস্ত্র নিয়ে ধর্মমেলা থেকে ফিরতেন। এ ধরনের অকল্পনীয় দানের কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

হিউয়েন সাং ভারতীয়দের সাধুতা, সরলতা ও ন্যায়পরায়ণতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। জনসাধারণের মধ্যে বেশভূষার বিশেষ বাহুল্য ছিল না এবং তারা অনাড়ম্বর জীবনযাপন করত। একমাত্র বিত্তশালীদের মধ্যে বেশভূষা ও অলংকারের বহুল প্রচলন ছিল।

হিন্দুসমাজে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণরা ধর্মকর্ম নিয়ে জীবনযাপন করত। ক্ষত্রিয়রা ছিলেন শাসকশ্রেণী। সে যুগের নৃপতিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ক্ষত্রিয়। বৈশ্যদের উপজীবিকা ছিল ব্যবসা বাণিজ্য। শূদ্ররা কৃষিকার্যে ও গৃহকর্মে নিযুক্ত হতো। সমাজে অসবর্ণ বিবাহ নিন্দনীয় ছিল। বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল না। সতীদাহ প্রথা সেযুগেও প্রচলিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

হিউয়েন সাং-এর বিবরণী থেকে সে সময়কার ভারতের প্রধান শহরগুলির বর্ণনা পাওয়া যায়। হুনরাজ মিহিরকুলের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে ভারতের দুটি প্রাচীন শহর তক্ষশীলা ও পেশোয়ার ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। প্রভবপুর (আধুনিক শ্রীনগর) একটি সমৃদ্ধ শহর ছিল। জলন্ধর ও মথুরা শহর দুটির পূর্বগৌরব বিনষ্ট হয়েছিল। হর্ষবর্ধনের রাজধানী কনৌজ সে সময়ে সমৃদ্ধির পথে ছিল। শহরটির দৈর্ঘ্য ছিল পাঁচ মাইল। শহরটির চতুর্দিকে সু উচ্চ প্রাচীর ও গভীর পরিখা দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিল। হিউয়েন সাং কনৌজ নগরীকে সমকালীন উত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র বলে অভিহিত করেছেন। আধুনিককালের মতো সে যুগেও প্রয়াগ (এলাহাবাদ) হিন্দুধর্মের প্রধান পীঠস্থান ছিল। এই শহরে ধর্মযাত্রী ও সন্ন্যাসীদের বিপুল সমাবেশ দেখে হিউয়েন সাং বিস্ময়াভিভূত হন। আধুনিককালের মতো সে যুগের বারাণসী শহরটি হিন্দুদের কাছে পরম পবিত্র ছিল।

এই শহরের অগণিত মন্দির ও এর সমৃদ্ধি চৈনিক পরিব্রাজককে বিস্মিত করেছিল। বারাণসীর হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্যও তাঁকে মুগ্ধ করে। হিউয়েন সাং-এর সময়ে পাটলিপুত্রের পূর্বগৌরব অন্তর্হিত হয়।

এছাড়াও ইৎসিং এর বর্ণনায়ও আমরা সপ্তম শতকের ইতিহাসের উপাদানের বর্ণনা পাই। যা নিম্নরূপ:

হিউয়েন সাং এর পরবর্তী চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং (৬৭২ ও ৬৮৮) খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ভারত পরিভ্রমণে আসেন। তিনি তদানীন্তন ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের এক মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইৎসিং ভারতীয়দের পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যসামগ্রীর পরিচ্ছন্নতার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন আহারের সময় তাঁরা একত্রে বসলেও পৃথক পৃথক পাত্রে আহার করত। ইৎসিং গ্রাম্যসংঘ কর্তৃক কৃষিকার্যের কথা উল্লেখ করেছেন। শস্যসংগ্রহের পর তা ছয় ভাগে ভাগ করা হতো এবং সংঘ এক ষষ্ঠাংশ ভাগ পেতো। ইৎসিং নালন্দার বৌদ্ধ মঠের ব্যবহারিক রীতি-নীতির কঠোরতার কথা উল্লেখ করেছেন। নালন্দার মঠে প্রায় ৩০০০ ভিক্ষু বসবাস করতেন। এই মঠের ব্যয় প্রায় দুইশত গ্রামের রাজস্ব থেকে নির্বাহ হতো।

Dhaka University Institutional Repository

ইৎসিং বলেন যে, তাঁর সময় ভারত আর্যদেশ নামে পরিচিত ছিল। সে সময় ভারত মধ্যদেশ নামেও অভিহিত হতো, কারণ তা ছিল বহুশত দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। আর্যদেশ ও মধ্যদেশ এই দুটি নামই ভারতীয়দের কাছে সুপরিচিত ছিল।

ইৎসিং-এর বর্ণনা থেকে সে সময়কার শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁর মতে সে যুগে শিক্ষাগ্রহণ ছিল কষ্টসাধ্য। ছাত্রদের বহুত্যাগ স্বীকার করে শিক্ষাগ্রহণ করতে হতো। সূত্রশাস্ত্র, কাব্য ও তর্কশাস্ত্র ছিল প্রধান পাঠ্যসূচি। সূত্রশাস্ত্রের উপর বেশি মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা হতো। [১৮]

## পঞ্চম-সপ্তম শতক পর্ব: সারসংক্ষেপ

সুপ্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে পঞ্চম শতকের আগে কিছু বলা কঠিন। পঞ্চম শতকের গোড়া থেকে প্রায় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত শ্রেণিবিন্যাসের সামাজিক চেহারাটা সুস্পষ্ট ধরতে পারা অনেক সহজ। এই পর্বে বাঙালি সমাজে প্রধানত শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যনির্ভরতা দেখা যায়। অর্থনৈতিক শ্রেণি হিসেবে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীর উল্লেখ না থাকলেও সমাজে ও রাষ্ট্রে তাদের প্রাধান্যের কথা জানা যায়। কৃষক, ক্ষেত্রকর, কৃষিকর্ম, সবই সমাজে ছিল, কৃষিকর্মের ফলে সমাজে ধনোৎপাদন হয়েছে, কিন্তু যেহেতু সমাজ প্রথমত ও প্রধানত শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য নির্ভর, এবং ভূমি সম্পদ ও কৃষিকর্ম সামাজিক ধনের স্বল্প অংশ মাত্র, সেই হেতু কৃষকরা তখনও সুসমৃদ্ধ-সুসম্বদ্ধ শ্রেণি হিসেবে গড়ে উঠবার অবকাশ পায় নি। সেইভাবে সমাজে ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভও করতে পারে নি। কিন্তু ষষ্ঠ শতকেই সামন্ত প্রথা স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, ভূমির চাহিদা বাড়তে আরম্ভ হয়েছিল, যা থেকে বোঝা যায় যে সমাজ তখন ভূমি সম্পদকেই প্রধান সম্পদ হিসেবে মেনে নেবার জন্য অগ্রসর হয়েছিল। সপ্তম শতকের শেষার্ধ ও অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ প্রায় জুড়ে ছিল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আবর্ত এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্রুত অগ্রগতির স্রোতে এই বিবর্তন যেন সম্পূর্ণ হল, শিল্প-ব্যবসা বাণিজ্য যেন ধনোৎপাদনের প্রথম ও প্রধান উপায় হিসেবে আর রইল না। এই পর্বে অভিজাত ও অনভিজাত রাজপুরুষ, ও রাজসেবকদের দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দেশে তখনও গড়ে উঠে নাই বলে রাজকর্মচারী ও রাজসেবকদের সুনির্দিষ্ট কোনো শ্রেণিও গড়ে উঠে নি। জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও নিয়ামক বুদ্ধি-বিদ্যা-জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণির পরিচয় এই যুগে সুস্পষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের মর্যাদা ও সম্মাননা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তারা যে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিপাল্য সেই দাবিও স্বীকৃতি পায়। নিম্নতর শ্রেণিস্তরের লোকেরা সমাজে থাকলেও তারা ছিলেন সমাজের প্রধান শ্রেণিগুলোর বাইরে। অর্থনৈতিক শ্রেণি হিসেবে তারা গড়ে উঠেনি, সেইজন্য তাদের কোনো মূল্যও স্বীকৃত হয় নি এবং তাদের নামও উল্লেখ হয় নি। সেইজন্য পঞ্চম হতে সপ্তম শতক পর্যন্ত বর্ণিত লিপিগুলোতে দেখা যায় বিভিন্ন রাজপুরুষদের কথা মহারাজাধিরাজের অধীনে রাজা, রাজক, রাজনক-রাজণ্যক, সামন্ত মহাসামন্ত এই সব নিয়ে যে অনন্ত সামন্তচক্র এরা রাজপাদোপজীবী। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, জাতকের গল্প, বাৎসায়নের কামসূত্র, মহাভারতের গল্প, গ্রিক ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, শিল্প বণিক ও ব্যবসায়ীদের একাধিক সুসমৃদ্ধ সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণি দেশে বিদ্যমান ছিল এবং রাষ্ট্রে ও সমাজেও তাদের প্রভাব এবং আধিপত্যও যথেষ্ট ছিল। প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠীরা শক্রধ্বজোত্থান পূজা (ইন্দ্রের ধ্বজার পূজা) উৎসব করতেন,

শ্রেষ্ঠীনঃ সম্প্রতি শক্রধ্বজ থৈঃ কৃত স্তবোচ্ছায়ঃ।
ঈষাংবা মোঢ়িং বাধূনাতনাস্ত্বাং বিধিৎসন্তি।।[১৯]

অর্থাৎ হে শক্রধ্বজ! যে শ্রেষ্ঠীরা (একদিন ) তোমাকে উন্নত করে গিয়েছিলেন সম্প্রতি সেই শ্রেষ্ঠীরা কোথায়! ইদানীং কালে লোকেরা তোমাকে (লাঙলের) ঈষ অথবা মেরি (গরু বাঁধিবার গোঁজ) করতে চাচ্ছে।

তাই উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় ‘হর্ষচরিতে’র প্রাক্কাল অর্থাৎ (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক) ও এর সমসাময়িক কালের ইতিহাসের উপাদান ও তৎকালীন সামাজিক অবস্থার বর্ণনা ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

# তৃতীয় অধ্যায়

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, পৃ. ১৩-২৩

২. *ভারতের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ হইতে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত), অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১৮৩-১৮৫

৩. প্রাগুক্ত ঐ পৃ. ১৮৪

৪. পূর্বোক্ত ঐ পৃ. ১৮২

৫. পূর্বোক্ত ঐ পৃ. ১৮৩-১৮৪

৬. পূর্বোক্ত ঐ পৃ. ২০৪

৭. প্রাগুক্ত ঐ পৃ. ২০৩-২০৪

৮. প্রাগুক্ত ঐ পৃ. ২০৫

৯. প্রাগুপ্ত ঐ পৃ. ২০৫-২০৬

১০. পূর্বোক্ত ঐ পৃ. ২০৪-২০৬

১১. প্রাগুক্ত ঐ পৃ. ২০৬

১২. প্রাগুক্ত ঐ পৃ. ২০৬-২০৮

১৩. *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, পৃ. ৬১-৬৫

১৪. *ভারতের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ হইতে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত), অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২০-২৫

১৫. *ভারতের ইতিহাস*, (প্রাচীন যুগ হইতে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত), অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২০৯

১৬. প্রাগুক্ত ঐ পৃ. ২১৬-২২০

১৭. *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৩২৬-৩২৮

১৮. *ভারতের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত), অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২২৮-২৩১

১৯. *বাঙালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ২৭৬-২৭৭

Dhaka University Institutional Repository

# চতুর্থ অধ্যায়

## হর্ষচরিতে ইতিহাস

**পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে ৭ম শতকের ঐতিহাসিক উপাদানের ভিত্তিতে হর্ষচরিতের ঐতিহাসিক উপাদান-**

হর্ষচরিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বর্ণনা পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বর্ণনা পাওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি আমাদের সাহায্য করে।

১। হিউয়েন সাং এর বিবরণী।

২। বাণভট্ট কর্তৃক রচিত হর্ষচরিত

৩। সমসাময়িক মুদ্রা ও লিপি (লিপিগুলির মধ্যে মধুবন লিপি, সোনপতি লিপি ও বানক্ষের লিপি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

আর এস ত্রিপাঠী, সি.ভি বৈদ্য, আর, কে মুখার্জী প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা চীনা ও ভারতীয় লিখিত উপাদানের তথ্যগুলিকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ডি দেবাহুতি, ড. শঙ্কর গোয়েল প্রমুখ সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকগণ বাণভট্ট ও হিউয়েন সাং- এর রচনাকে সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না।

পুষ্পভূতি বংশের উৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পূর্ব-পাঞ্জাবের অন্তর্গত থানেশ্বরে হর্ষবর্ধনের পূর্বপুরুষেরা রাজত্ব করতেন বলে অনেকে মনে করেন। বাণভট্টের বিবরণ অনুসারে পুষ্পভূতি ছিলেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু বাণভট্ট পুষ্পভূতির উত্তরাধিকাধিদের কোনো নাম উল্লেখ করেন নি। তিনি প্রভাকরবর্ধনকে নিয়ে তার গ্রন্থ রচনা শুরু করেন।[২]

প্রভাকরবর্ধন (৫৮০-৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে থানেশ্বর রাজ্য শক্তিশালী হয়ে সাম্রাজ্যের পথে অগ্রসর হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে প্রভাকরবর্ধন হুন, গুর্জর ও মালবদিগকে পরাজিত করে মালব ও গুজরাট পর্যন্ত নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন। সুতরাং প্রভাকরবর্ধনের রাজত্বের সময়কালে হুন, গুর্জর ও মালবদিগরা প্রমুখ যে শক্তিশালী ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও আমরা মৌখরীরাজ নামক বংশের কথা জানতে পারি। সেই মৌখরীরাজ অবন্তিবর্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র গ্রহবর্মার সঙ্গেই প্রভাকরবর্ধন তার একমাত্র কন্যা রাজ্যশ্রীর বিয়ে দিয়েছিলেন।[৩] রাজ্যবর্ধন যখন অস্ত্রগ্রহণে যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন তখনই প্রভাকরবর্ধন তাঁকে প্রভুভক্ত সামন্তদের সাথে উত্তরে পাঠালেন হুনদের দমন করার জন্য। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রভাকরবর্ধন পুরোপুরিভাবে হুনদের দমন করতে পারেন নি।

প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্যবর্ধন ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তিনি আর সিংহাসনে বসবেন না সন্ন্যাস গ্রহণ করে বনে চলে যাবেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই সংকল্পের সাথে সহমত পোষণ করে হর্ষও তাঁর অনুগামী হবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

কিন্তু রাজ্যশ্রীর সংবাহক নামক এক দূত এসে জানালো যে, প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুসংবাদ কান্যকুব্জে পৌছানোর দিনই 'মালবরাজ' রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মাকে হত্যা করেছে এবং রাজ্যশ্রীকে কারাগারে বন্দী করেছে। এছাড়াও মালবরাজ যে স্থানীশ্বর আক্রমণ করতে উদ্যত একথা জানতেও কালবিলম্ব করলেন না সংবাহক। একথা শুনে রাজ্যবর্ধন তৎক্ষনাৎ ভণ্ডিসহ একহাজার সৈন্য নিয়ে মালব আক্রমণ করতে চললেন। এখানে লক্ষনীয় যে, রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মার মৃত্যুর সাথে মালবরাজের জড়িত থাকার কারণে রাজ্যবর্ধন মালবরাজ্যের মালবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন সুতরাং আমরা মালবরাজ্যের কথা জানতে পারি। উক্ত অভিযানে মালবরাজকে রাজ্যবর্ধন সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি নিহত হয়েছিলেন গৌড়েশ্বরের হাতে। এই গৌড়েশ্বরই, যে শশাঙ্ক তা আমরা অনুমান করতে পারি।

কেননা ষষ্ঠসর্গে 'প্রকটকলঙ্ক-মুদয়মনে-বিষঙ্কটবিষানোৎকীর্ণ-পঙ্ক-সংকর-শংকরশকুর-শক্করককুদ ফুটসঙআশসমকাশতাকাশে শশাঙ্কমন্ডলম।'[৪] এই উদ্ধৃতিতে 'শশাঙ্কের শ্লিষ্ট অর্থ যে গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক এমন অনুমান করেছেন টীকাকার। মনে হয় শ্লিষ্ট অর্থ বাণের বাঞ্ছিত নয়, তিনি ঐ গৌরধামের নামোচ্চারণই করতে চাননি।

'নামাপি গৃহতোঽস্য পাপকারিণঃ পাপমলেন ইব মে জিহ্বা।'[৫] গৌররাজের হাতে রাজ্যবর্ধনের নিধন সম্বন্ধে বাণভট্ট লিখেছেন যে, মিথ্যা উপচারে আশ্বস্ত হয়ে নিরস্ত্র রাজ্যবর্ধন একাই

Dhaka University Institutional Repository

গৌড়রাজের ভবনে যান এবং সেখানে গৌড়রাজ তাকে বধ করেন। হর্ষচরিতের টীকাকার শঙ্কর লিখেছেন যে, শশাঙ্ক তাঁর কন্যার সঙ্গে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে রাজ্যবর্ধনকে নিজের ভবনে আনেন এবং রাজ্যবর্ধন সঙ্গীদের নিয়ে আহারে রত হলে ছদ্মবেশে তাকে হত্যা করেন।
ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসেই আমরা দেখতে পাই যে, গৌড়েশ্বরের হাতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর সংবাদ শুনে তৎক্ষণাৎ গজ সেনাধ্যক্ষ স্কন্দগুপ্তকে ডেকে গজসেনা প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন হর্ষ।
স্কন্দগুপ্তও তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য করলেন, কিন্তু তিনি সেইসাথে হর্ষকে প্রভূত ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সাবধান হতেও পরামর্শ দিলেন।

সপ্তম উচ্ছ্বাসের শুরুতে দেখা যায় যে, রাজ্যাভিষেকের পর হর্ষ বিশ্বজয়ে নির্গত হলেন। এখানে প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজার সাথে হর্ষের দেখা হলো, সেই রাজা হর্ষকে নানা উপহার সামগ্রী দিলেন এবং হর্ষ তা গ্রহণ করলেন। পথে ভণ্ডির সাথে হর্ষের দেখা হলে ভণ্ডী হর্ষকে অবগত করলেন যে, রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বিন্ধ্যবনে আশ্রয় নিয়েছেন। আর তখনই হর্ষ গৌড়েন্দ্রের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের ভার ভণ্ডির উপর অর্পণ করে নিজে রাজ্যশ্রীর অন্বেষণে বিন্ধ্যপর্বতে প্রবেশ করলেন।

অষ্টম উচ্ছ্বাসের শুরুতে দেখা যায় যে, রাজ্যশ্রীর খোঁজে দিশেহারা হর্ষ। শরভকেতুর পুত্র ব্যাঘ্রকেতুর কাছ থেকে রাজ্যশ্রীর সংবাদ পেলেন। এছাড়াও সেই ভীলযুবক রাজাকে দিবাকর মিত্র নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর কথাও বলেছিলেন যে কিনা এক সময় রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মার বন্ধু ছিল। রাজ্যশ্রী জলন্ত চিতায় নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে উদ্যত হলে দিবাকর মিত্র ও হর্ষ সকলে মিলে তাকে বাঁচালেন। হর্ষ রাজ্যশ্রীকে দিবাকর মিত্রের অভিভাবকতায় রেখে গৌড়েন্দ্রকে বধ করার জন্য গঙ্গাতীরে সেনাদলের মধ্যে ফিরে গেলেন। যাবার সময় রাজ্যশ্রীকে বলে গেলেন যে, গৌড়েন্দ্রকে বধ করে তিনিও কাষায় গ্রহণ করবেন। কিন্তু হর্ষ গৌড়েন্দ্রকে বধ করেছিলেন কিনা তা শেষ পর্যন্ত জানা যায়নি। কেননা বাণভট্ট অষ্টম উচ্ছ্বাসেই এর পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

## ‘হর্ষচরিতে’র ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণ

মানব সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে যুগের পর যুগ কীভাবে অগ্রসর হয়েছে তার ধারাবাহিক বিবরণ ইতিহাসের বিষয়বস্তু। মানুষের অতীত কর্মকাণ্ড সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতির ধারাবাহিক আলোচনা ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ঐতিহাসিক ই.এইচ, কার $(E.H.Carr)$ এর মতে, ‘ইতিহাস হল বর্তমান ও অতীতের মধ্যে অন্তহীন সংলাপ।’ মোটকথা ইতিহাস মানুষের অতীত কার্যাবলির দর্পণ।

ঐতিহাসিক দিক বিশ্লেষণ করলে ‘হর্ষচরিতে’র মূল্য অপরিসীম। ঐতিহাসিক পদকাব্যে কল্‌হনের রাজতরঙ্গিণীর যে স্থান, ঐতিহাসিক গদ্যকাব্যে ‘হর্ষচরিতে’র সেই স্থান। বাণভট্ট ঐতিহাসিক পটভূমিতে ‘হর্ষচরিত’ রচনা করেছেন।

এই কাব্যে বহু রাজকুল এবং বংশের নাম পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য কাব্যের পঞ্চম উচ্ছ্বাসেও পরিলক্ষিত হয় যে হুনদের পুনরায় দমন করার জন্য প্রভাকরবর্ধন রাজ্যবর্ধনকে উত্তরে পাঠালেন। ভারতেবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করেও জানা যায় যে, ভারতবর্ষ বারবার হুনজাতিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় রাজারা বহুবার তাদের প্রতিহত করেন।

এছাড়াও হর্ষচরিতে আমরা সিন্ধুদেশ, গান্ধার, লাট ও মালব দেশের রাজাদের সঙ্গে প্রভাকরবর্ধনের যুদ্ধের বিবরণ পাই। যার ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে । কেননা সিন্ধুদেশ, গান্ধার, লাট ও মালব দেশের বর্ণনা পরবর্তীতেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক উপাদান রূপে হিউয়েন সাং এর বিবরণী অত্যন্ত মূল্যবান। এর মধ্যে সপ্তম শতাব্দীর ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, ধর্মনৈতিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতি ব্যবস্থার এক মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাং হর্ষবর্ধনের রাজত্ব কালে ভারতবর্ষে আসেন এবং ধারণা করা হয় যে, (৬৩৫-৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় আট বছর হর্ষবর্ধনের অনুগ্রহ ও সখ্যতা লাভ করেন। সুতরাং হর্ষবর্ধন সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জনের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থারও ভূয়সী প্রশংসা করেন হিউয়েন সাং।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি হর্ষের সেনাবাহিনী, রাজস্ব, শিক্ষা, দণ্ডবিধি, ধর্ম সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেছেন খুব কাছ থেকে এবং সকল কিছুর প্রশংসা করেছেন।[৬]

এছাড়াও বাণভট্ট এখানে গৌড়েশ্বরের কথা বলেছেন। গৌড়েশ্বরের হাতে রাজ্যবর্ধনের নিহত হওয়ার কথা বলেছেন। এই গৌড়েশ্বরই যে শশাঙ্ক তা বাণভট্ট বলেননি।

সপ্তম উচ্ছ্বাসের শুরুতে দেখা যায় হর্ষের রাজ্যাভিষেক হয়েছে। তিনি বিশ্বজয়ে নির্গত হলেন। তিনি প্রথমে থামলেন রাজধানীর কাছে সরস্বতী নদীর তীরে। সেখানে গ্রাম-প্রধান তাঁকে বৃষচিহ্ন সোনার মোহর উপহার দিলেন এবং তাঁর হস্তাক্ষর দিয়ে আজ্ঞাপত্র জারি করলেন। এর ঐতিহাসিক মূল্যও অনেক। এর মাধ্যমে আমরা তৎকালীন সময়কার ইতিহাসের নানা উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি।

ইতিহাস উৎসভিত্তিক, আর উৎস ছাড়া ইতিহাস হয় না। ইতিহাস চর্চার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার গভীরে নিহিত কার্যকারণ উদঘাটন করা। ক্ষীরস্বামী-ইতিহাস শব্দের অর্থ লিখেছেন, 'ইতি হ আসীদ্যতে তিহাস, ইতিরে বমর্থে হঃ কিলার্থ'।

এই রূপই ঘটেছিল (ইতি-হ-আস) সেখানে অর্থাৎ যাতে অতীত ঘটনার বৃত্তান্ত থাকে, তা ইতিহাস পুরাবৃত্ত বা পূর্বচরিতই ইতিহাস, অক্সফোর্ড ইংরেজী অভিধানে ইতিহাসের সংজ্ঞা এরূপ- "That branch of Knowledge which deals with past events, as recorded in writing or otherwise ascertained."[৭]

সুতরাং বাণভট্টের হর্ষচরিতে বর্ণিত নানা ঐতিহাসিক ঘটনা ও বিষয়াবলি পর্যবেক্ষণ করে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, ঐতিহাসিক দিক থেকে 'হর্ষচরিত' উচ্চতর মর্যাদার আসনে আসীন এবং এর ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

# চতুর্থ অধ্যায়

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. *ভারতের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত), অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন, ২০০০, প্রকাশক: মৌলিক লাইব্রেরি, ১৮বি. শ্যামাচরন দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২২০

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২২১

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২২৩

৪. *হর্ষচরিত*, বাণভট্ট: (১৮শ খণ্ড), সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, প্রধান উপদেষ্টা: ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রকাশক: নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ: ২২ জুন ১৯৮৭, পৃ. ২৯০

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৬. *ভারতের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত), অতুল চন্দ্র রায় ও প্রনবকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতের ইতিহাস প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারী ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন, ২০০০, প্রকাশক: মৌলিক লাইব্রেরি, ১৮বি. শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২২৮

৭. *HPR Finberg (ed) Approaches of History,* London 1962,
P. 135-140

Dhaka University Institutional Repository

# পঞ্চম অধ্যায়

## হর্ষচরিতে তৎকালীন সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সংস্কৃতির যে পরিচয় পাই তার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো-

হর্ষচরিতে আমাদের সম্মুখে তৎকালীন সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সংস্কৃতির এক চমৎকার দৃশ্য মূর্তমান হয়ে উঠে।

### রাজনৈতিক অবস্থা

'হর্ষচরিতে' রাজনৈতিক অবস্থার যে চিত্র ফুটে ওঠে সেখানে দেখা যায় যে, পুষ্পভূতিবংশের রাজা প্রভাকরবর্ধনের সময় থেকে হুন ও গুর্জর রাজারা শক্তিশালী ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন সময় স্থানীশ্বর আক্রমণ করতেন। এছাড়াও সিন্ধুদেশ, গান্ধার, লাট ও মালব দেশের রাজারাও বিভিন্ন সময় স্থানীশ্বর আক্রমণ করতেন। প্রভাকরবর্ধন বিভিন্ন কূটকৌশল ও যুদ্ধ নীতি প্রয়োগ করে তাদের পরাজিত করেন। প্রভাকরবর্ধন যে হুনদের সর্বতোভাবে দমন করেছিলেন একথা আমরা পুরোপুরিভাবে বলতে পারি না। কেননা 'পঞ্চম উচ্ছ্বাসে' দেখা যায় যে, রাজ্যবর্ধন যখন অস্ত্রগ্রহণে যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন তখন প্রভাকরবর্ধন তাঁকে প্রভুভক্ত সামন্তদের সাথে উত্তরে পাঠালেন হুনদের দমন করার জন্য। এছাড়াও 'ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে' আমরা দেখতে পাই যে, প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু সংবাদ শুনে রাজ্যবর্ধন দৃঢ় সংকল্প করলেন তিনি আর সিংহাসনে বসবেন না, সন্ন্যাস গ্রহণ করে বনে চলে যাবেন। ভাইয়ের এই সংকল্পের সাথে হর্ষও সহমত পোষণ করলেন। কিন্তু ইতোমধ্যেই রাজ্যশ্রীর সংবাহক নামক এক দূতের প্রবেশ আমরা দেখতে পাই, যে কিনা রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মার মৃত্যসংবাদ নিয়ে আসে। সে জানায় গ্রহবর্মাকে মালবরাজ হত্যা করেছে এবং রাজ্যশ্রীকে বন্দি করেছে সুতরাং 'চতুর্থ উচ্ছ্বাসে' প্রভাকরবর্ধন মালবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে পুরোপুরি পরাজিত করেছিলেন এ কথা বলা যায় না। কারণ মালবরাজ যদি প্রভাকরবর্ধনের হাতে নিহত হতো তাহলে সে গ্রহবর্মাকে হত্যা করতে পারত না।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসেই আমরা আরও দেখতে পাই যে, রাজ্যশ্রীর সংবাহক নামক দূতের কাছ থেকে গ্রহবর্মার মৃত্যুসংবাদ ভগিনী রাজ্যশ্রীর বন্দিদশা ও মালবরাজ কর্তৃক স্থানীশ্বর আক্রমণের সমূহ সম্ভাবনার কথা শুনে রাজ্যবর্ধনের বৈরাগ্য ক্রমেই ক্রোধে পরিণত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তৎক্ষণাৎই ভণ্ডিসহ প্রায় এক হাজার সৈন্য নিয়ে মালবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন মালবরাজকে পরাজিত করেছিলেন ঠিকই কিন্তু অশ্বারোহী সেনানী কুন্তলের বর্ণনা অনুযায়ী আমরা জানতে পারি যে, রাজ্যবর্ধন গৌড়েশ্বরের হাতে নিহত হয়েছেন। এ কথা শোনার সাথেই হর্ষ ভ্রাতৃবিয়োগে অধীর হয়ে পড়লেন। কিন্তু তার বৈরাগ্যকে ক্রোধে রূপান্তরিত করতে তাকে সাহায্য করেছিল বৃদ্ধ সেনাপতি সিংহনাদ। হর্ষ বিদেশ-সচিব অবন্তিকে ডেকে সমস্ত রাজাদের এ কথা জানিয়ে দিতে বলেছিলেন যে, হয় তারা মাথা নত করবে, নয়তো অস্ত্র ধারণ করবে। এছাড়া হর্ষ গজ সেনাধ্যক্ষ স্কন্দগুপ্তকে ডেকে সমস্ত গজসেনা প্রস্তুত করার আদেশ প্রদান করলেন। যাতে সে সহজেই গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে পারেন।

সপ্তম উচ্ছ্বাসে আমরা দেখতে পাই রাজ্যাভিষেকের পর হর্ষ বিশ্বজয়ে নির্গত হলেন এ সময় ভণ্ডি এসে হর্ষকে সংবাদ দিল যে, গুপ্ত যখন কান্যকুব্জ অধিকার করেছিল তখন রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে পলায়ন করে বিন্ধ্যবনে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আর তৎক্ষণাৎই হর্ষ গৌরেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযানের ভার ভণ্ডির উপর অর্পণ করে ভগিনী রাজ্যশ্রীর অন্বেষণে বিন্ধ্যবনে প্রবেশ করলেন।
অষ্টম উচ্ছ্বাসে আমরা দেখতে পাই যে, হর্ষ রাজ্যশ্রীকে খুঁজে পেয়েছেন। যে কিনা জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এ অবস্থা থেকে হর্ষ রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করে বৌদ্ধভিক্ষু দিবাকর মিত্রের অধীনে দিয়ে পুনরায় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন।

'হর্ষচরিতে' যে রাজনৈতিক অবস্থা আমরা দেখতে পাই তা থেকে এ ধারণাই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের রাজারা স্থানীশ্বর আক্রমণ করেছেন, তাদের মধ্য থেকে মালবরাজের হাতে রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মার মৃত্যু আর গৌড়েন্দ্রর হাতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু। এককথায় এক অস্থির রাজনৈতিক চিত্রই আমাদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেখানে রাজাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। চলত রাজনৈতিক চক্রান্ত ও দলবাজি। পরবর্তীতে হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতের একটি বৃহৎ অংশকে একতাবদ্ধ করে শান্তি ফিরিয়ে আনেন।

Dhaka University Institutional Repository

## অর্থনৈতিক অবস্থা

'হর্ষচরিতে' প্রতিফলিত তৎকালীন সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধশালী ছিল একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়, কারণ সমাজের সর্বত্রই ছিল শ্রী ও সমৃদ্ধির চিত্র। যা সুশাসনের সাক্ষ্য বহন করত। সমাজে নানা রকমের নানা পেশার মানুষের সমাবেশ দেখা যায়। যাদের মধ্যে কেউ চারণ, কেউ লেখক, কেউ চিত্রকর, কেউ গায়ক, কেউ নর্তক, কেউ নট, কেউ প্রসাধিকা, কেউ ধনী ব্যবসায়ী, কেউ ভাষাকবি, আরও নানা রকম পেশা ও বৃত্তির মানুষের সমাবেশ দেখা যায়। সবাই তাদের স্ব স্ব কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী। যার উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কামারশালে হাতুরীর শব্দ, চাষী তুলোর চাষের জন্য গাঁটবেঁধে রেখেছে অসংখ্য তুলোর পালা, চাষীদের কারো মাথায় শোনের মূল বা অতশী পাটের গাঁটি। গাড়ি বোঝাই সার চলছে যার মধ্যে রয়েছে ছাই, পচাপাতার সার, কালো ঘুটের সার।

তৃতীয় উচ্ছ্বাসের শুরুতে আমরা যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা জানতে পারি তা হলো :

নিজবর্ষাহিতস্নেহা বহূভক্তজনান্বিতাঃ।
সুকালা ইব জায়ন্তে প্রজাপূণ্যেন ভূভুজঃ॥[১]

(অর্থাৎ বর্ষাকালের সুবর্ষণে মাটি স্নেহার্দ্র হয়ে ওঠে ও তাতে প্রচুর অন্নশস্য জন্মে। এরূপ সুসময়ের মতোই স্বদেশপ্রেমী বহু ভক্তজনের দ্বারা যুক্ত হয়ে রাজারা সুখে বিরাজ করেন। প্রজাদের পুণ্যবলেই তা সম্ভব হয়।

তৃতীয় উচ্ছ্বাসেই আমরা শ্রীকণ্ঠজনপদের বর্ণনায় দেখতে পাই যে, কোনো কোনো স্থানে ফলসম্পদে পূর্ণ অনেক বড় বড় গাছ রয়েছে। শত শত পথিকজন সে সব ফল খেয়ে তৃপ্তি লাভ করে। এছাড়াও শ্রীকণ্ঠজনপদেও বহুঅতিথি অভ্যাগতের সমাবেশ হয়। তারাও প্রভূত ঐশ্বর্যবান। শত শত পথিক সে সব অতিথিদের কাছ থেকে অনেক টাকাকড়ি পায়। এছাড়াও শ্রীকণ্ঠজনপদ এতই সমৃদ্ধ ছিল যে, তার ঘোলে ও দুধের স্রোতে মাটি ভিজে থাকত। আর এজন্য মাটিতে সোনার ফসল ফলত। যা দেশকে সম্পদশালী আর সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিল।

তৃতীয় উচ্ছ্বাসেই আমরা স্থানীশ্বরের বর্ণনা পাই। যা ছিল শ্রীকণ্ঠজনপথের একটি প্রদেশ। এই স্থানীশ্বর প্রদেশ ছিল বিশাল বিশাল সেনাবাহিনীতে মুখরিত উত্তর কুরুদেশের শত্রু।

Dhaka University Institutional Repository

কর আদায়ের জন্য রাজারা প্রজাদের উপর যে অত্যাচার চালাতো স্থানীশ্বরের প্রজারা তেমন অত্যাচার অনুভব করত না। তাই মনে হতো যেন এই স্থানীশ্বর ময়দানব নির্মিত (তিনটি পুরীকে) জয় করতে ইচ্ছুক হয়েছিল। স্থানীশ্বরের রমণীদের যে বর্ণনা পাই, তাতে বলা হয়েছে যে, তাঁরা মাতঙ্গগামিনী, গোজগামিনী, সচ্চরিত্রা, গৌরবর্ণা ও ঐশ্বর্যশালিনী। সুতরাং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্থানীশ্বর যে উন্নত ছিল এ কথা অবলীলায় বলা যায়। এছাড়াও ভৈরাবাচার্য নামে এক পরিব্রাজক ছিল যে কিনা প্রত্যহ পাঁচ পাঁচটি করে রৌপ্য প্রত্যহ রাজা পুষ্পভূতিকে দান করতেন।

চতুর্থ উচ্ছ্বাসে রাজা প্রভাকরবর্ধনের যে বর্ণনা পাই, সেখানে বলা হয়েছে যে,

'যস্য চাসন্নেষু ভৃত্যরত্নেষু প্রতবিম্বতেব তুল্যরূপা সমলক্ষ্যত লক্ষ্মীঃ।'[২]

অর্থাৎ তার সম্পদ লক্ষ্মী তাঁর পার্শ্ববর্তী ভৃত্য রত্নসমূহ প্রতিবিম্ব হওয়ায় যেন সমান রূপ ধারণ করেছিল অর্থাৎ রাজা তাঁর সন্নিকটবর্তী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও নিজের মতোই ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে প্রতিভাত হয় যে, রাজা নিজে সম্পদশালী ছিলেন বিধায় অপরকেও দান করতে পেরেছিলেন। এছাড়াও দেখতে পাই যে, 'যশ্চ বৈরমুপায়নং বিগ্রহমনু গ্রহংসমরাগমং মহোৎসবং শত্রুং নিধিদর্শনমরিবাহুল্য মভ্যুদয়মাহবাহ্বনং বরপ্রদানভবস্কন্দ পাতং দিষ্ট বৃদ্ধিংশস্ত্র প্রহারপঅং বসুধারারসমমন্যত'।[৩]

অর্থাৎ রাজা প্রভাকরবর্ধন অন্য রাজাদের দ্বারা তাঁর প্রতি শত্রুতাকে ভেট (উপহার) যুদ্ধঘোষণাকে অনুগ্রহ, যুদ্ধঘোষণাকে মহোৎসব, শত্রুকে অর্থভাণ্ডার সাক্ষাৎকার, শত্রুর বাহুল্যকে উন্নতি, যুদ্ধের আহ্বানকে বরদান, শত্রুর অকস্মাৎ আক্রমণকে ভাগ্যবৃদ্ধি, শস্ত্রাঘাতে শত্রুর পতনকে ধনসম্পদের নদী বলে মনে করতেন।

এছাড়াও বলা হয় যে, কাঞ্চনময়সর্বোপকরনৈর্বিভবৈর্বিশীর্ণমিব মেরুণা,
দ্বিজদীয়মানৈরার্থকলশৈঃ ফলিতমিব ভাগ সম্পদা।'[৪]

অর্থাৎ সেখানে যাবতীয় পত্রাদি উপকরণ সমস্তই স্বর্ণময় ছিল বলে মনে হতো যে, সুমেরুপর্বতকে যেন খণ্ড খণ্ড করে ফেলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মণগণকে ধনপূর্ণ কলশ দান করা হতো বলে মনে হতো যেন ভাগ্যবলে সম্পদ প্রাপ্তি কথাটা সফল হয়েছিল। সুতরাং রাজা প্রভাকরবর্ধনের সময় স্থানীশ্বর যে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ছিল একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

রাজা প্রভাকরবর্ধনের স্ত্রী ছিলেন যশোমতী যিনি বিলাসে ছিলেন মদিরারূপিনী, ছিলেন ধনসঞ্চয়ে কোষরূপিণী, অনুগ্রহবিতরণে ধনবৃষ্টিরূপা (অর্থাৎ প্রার্থীদের উপর বৃষ্টি ধারার মতো ধন বিতরণ করতেন)। কোষ অর্থাৎ ধনসংগ্রহের বেলায় যেন পদ্মরূপা ছিলেন তিনি। এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, রাজা প্রভাকরবর্ধন ধনসম্পদে সমৃদ্ধশালী ছিলেন বলেই রানী যশোমতী অকাতরে দান-ধ্যান করতে পেরেছিলেন।

হর্ষ জন্মগ্রহণ করেছেন আর তাই পারিতোষিক রূপে পূর্ণপাত্র দান করা হয়েছিল।
স্থানীশ্বরে বসবাসরত সাধারণ জনগণও যে সুখে শান্তিতে বসবাস করত এবং অর্থনৈতিক ভাবে স্বচ্ছল ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রভাকরবর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র হর্ষের জন্মের পর। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, হর্ষের জন্মের পরদিন সকলেই নেচে-গেয়ে আনন্দ-ফূর্তিতে হর্ষের জন্মোৎসব পালন করেছে, তার মধ্যে একদল বড়ো বড়ো করণ্ডকের মধ্যে স্থানীয় চূর্ণ পরিব্যপ্ত পুষ্পমালাসমূহ বয়ে আনছে, আর একদল শ্বেতপাথরের টুকরোর মতো স্বচ্ছ কর্পূরখণ্ড দিয়ে পূর্ণ করা বহুসংখ্যক পাত্র নিয়ে আসছে, আর একদল আসছে সুবাসিত কুঙ্কুমচুর্ণে ভরা মণিময় পাত্র রাশি নিয়ে। আরও একদল এসেছিল হাতির দাঁতের পেটিকা যাতে চন্দনের মতো শুভ্র সুপারির ফালিতে সাজানো পেটিকাগুলোকে দন্তুর বলে মনে হয়। এভাবেই অগণিত ভৃত্যবাহিনী অসংখ্য উপহার সামগ্রী নিয়ে রাজদরবারে হর্ষকে দেখতে আসে।

জামাতা গ্রহবর্মা রাজ্যশ্রীর বিবাহযাত্রায় যেসব হাতি নিয়ে এসেছেন সেসব হাতিদের কানের সঙ্গে লেগে থাকা চামরগুলি সঞ্চালিত করছে। সোনা দিয়ে মোড়ানো সমস্ত সাজসজ্জা যুক্ত রঙ্গিন বস্ত্র হাতিগুলির পিঠের উপর থেকে ঝুলছে। বর্ণক (রঙিন বস্ত্র) থেকে ঝুলানো ঘণ্টাগুলি ঠন ঠন করে বাজছে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজ্যশ্রীর বাসরঘরের যে বর্ণনা পাই তাতে দেখা যায় যে, সুন্দর শোভনীয় শয়নীয় পালঙ্ক; ঘরে একদিকে রয়েছে সোনার পিকদান এবং অন্য পাশে গজদন্ত নির্মিত পাত্র হাতে দাঁড়ানো এক সোনার পুতুল যার আর এক হাতে ধরা আছে এক দীর্ঘ নালদণ্ডসহ পদ্ম ফুল, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী। পালঙ্কে সুন্দর  চাদর বিছানো শয্যা। তাতে সুসজিত উপাধান পালঙ্কের শিরোভাগে স্থাপিত রয়েছে রৌপ্যনির্মিত নিদ্রা কলস এবং তার উপর কুমুদকুসুম । আর এতে বাসরঘরের শোভা এমন হয়েছে যাতে মনে হয় যেন কামদেব সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়েছেন। সপ্তম উচ্ছ্বাসে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা কুমার (ভাস্কর বর্মা) হর্ষকে একটি ছত্র উপহার দিয়েছিল যা ছিল মূলত বরুণদেবের, কিন্তু ঘটনাচক্রে রাজা কুমারের হাতে এসে পড়েছিল।

এরপর কুমারদূতের কর্মচারীরা অবশিষ্ট উপহারগুলিও ক্রমে ক্রমে উজাড় করে দেখালো। সেগুলির মধ্যে ছিল অলঙ্কারাদি, জড়ীকৃত বহু মূল্য রত্নসমূহ, যাদের কিরণে সব দিক লাল হয়ে উঠেছিল। এসব অলঙ্কারাদি যা আদি প্রসিদ্ধ রাজাদের সময় থেকে কুলক্রমে চলে আসছে। সেসব অলংকারগুণেও ছিল প্রসিদ্ধ।

এছাড়া ছিল উৎকৃষ্ট শ্রেণির চূড়ামণি যাদের প্রভায় অন্য সব কিছুই দীপ্তমণ্ডিত হয়ে উঠছিল। বক্ষহার যা ক্ষীরদ সমুদ্রের শুভ্রতার প্রতীক ছিল। আরও ছিল রেশমী বস্ত্র এসব শরৎকালীন জোৎস্নার মতো বিচিত্র রঙের ছিল। বস্ত্রগুলি সুশোভিত রুচি অঙ্কিত এক বেত্রপেটিকায় গোলাকারে সঞ্চিত ও চটকদার দিল। আরও ছিল পানপাত্র বা মধুপানের চষক সুদক্ষ শিল্পীরা নকশা কেটে মুক্তাফলের আধার, ঝিনুক, শঙ্খ ও স্ফটিকা দিয়ে যা নির্মান করেছিলেন।

অষ্টম উচ্ছ্বাসের শুরুতেই কবি বলেছেন:

> সহসা সম্পদেয়তা মনোরথপ্রার্থিতানি বস্তুনি।
> দৈবেনাপি ক্রিয়তে ভব্যানাং পূর্বসেবেব' ॥১
> বিদ্বজ্জনসম্পর্কো নষ্টেষ্টজ্ঞাতিদর্শনাভ্যুদয়ঃ।
> কস্য ন সুখায় ভবনে ভবতি মহারত্নলাভশ্চ ॥'২'[৫]
> অর্থাৎ মহৎব্যক্তিদের মনোবাঞ্ছা অপ্রত্যাশিতভাবে পূরণ করে দৈব যেন আগে থেকেই তাদের সেবা করেন।'১'

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্বজ্জনের সম্পর্ক, বিস্মৃত প্রিয় জনের দর্শন আর নিজের গৃহে বহুমূল্য রত্নলাভ কার না প্রীতিকর হয়? '২'

সুতরাং এর মাধ্যমেও বোঝা যায় যে, কবি আকার ইঙ্গিতে বিভিন্ন ভাবে অর্থনৈতিক দিকের কথা ব্যক্ত করেছেন।

## সামাজিক অবস্থা

'হর্ষচরিতে' তৎকালীন সমাজের এক নিপুণ চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম উচ্ছ্বাসেই কবি বলেছেন যে, সরস্বতী আর সাবিত্রী দুই তরুণী যারা তাদের অতুলনীয় রূপ মাধুর্য নিয়ে নদীর তীরে নিকুঞ্জে বাস করছে সঙ্গে অভিভাবক কেউ নেই। যার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের নিরাপত্তা বেষ্টনির এক সুন্দর চিত্র ফুটে ওঠে। সমাজে নানা রকমের নানা পেশার মানুষের বসবাস ছিল। গ্রামের এক চমৎকার দৃশ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। যার মধ্যে রয়েছে খড়ের ঘর, তার পাশে নিম আর বটগাছ, কাছেই আঁখের খেত। বেড়ায় ঘেরা বাগান। কারো বাঁকে ফল আর কারো বাঁকে মৌচাকের মোমের মেলা। সমাজে যেমন ছিল রাজা-রানী, তেমনি ছিল সাধারণ অমাত্য আর দাস-দাসী। যারা রাজার আজ্ঞাবহ ছিল। এছাড়াও দীর্ঘাধ্বগ লেখবাহ ডাকহরকরা ছিল।

আরও দেখতে পাই সারা পথ দৌড়ে এসে হর্ষের হাতে চিঠি দিচ্ছে মেঘলক, যা ছিল আখরঙা, কাদামাখা। কিছু সাধারণ সেবকও ছিল যারাও ছিল রাজার আজ্ঞাবহ। তারা চির আন্তরিক, বিনম্র, অত্যন্ত বিশ্বস্ত, প্রভুর একান্ত স্বজনের মতো।

সমাজে চতুরাশ্রম ও চাতুর্বর্ণ্য প্রথা বিদ্যমান ছিল। আশ্রম ও তপোবনের সঙ্গে গৃহস্থদের একটা গভীর যোগাযোগ ছিল। সমাজে সতীপ্রথা বা সহমরণ প্রথার উপস্থিতি ছিল। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু অত্যাসন্ন জেনে রানী যশোমতী তার যাবতীয় ধনসম্পদ ব্রাহ্মণদের দান করলেন, এবং পতির সঙ্গে সহমরণে যাওয়ার উপযোগী বস্ত্রভূষণ তিনি পরিধান করেছেন। তিনি সীতাদেবীর মতোই পতির আগে অগ্নিতে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম উচ্ছ্বাসেও যেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। যেখানে স্বামীহারা রাজ্যহারা রাজ্যশ্রী জ্বলন্ত চিতার আগুনে আত্যাহুতি দিতে প্রস্তুত। যা একই অনুসরণ ইচ্ছারই দ্যোতনা সৃষ্টি করছে। সমাজে অন্যান্য সংস্কারও ছিল। 'গ্রহবৈগুণ্যেই দুর্দৈব' এ বিশ্বাসও ব্যাপক আকারে ছিল। হর্ষকে রাজ্যবর্ধন রাজ্যভার গ্রহণ করতে বললে তাকে তিনি দুর্দেব বলেই আখ্যায়িত করেছিলেন। হর্ষ মনে করেছিলেন তার গ্রহগুলো যেন এক একটি দুষ্ট ক্রীড়ায় মত্ত।

সমাজে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বিভেদ ছিল। মেয়েরা ছেলেদের মতো সমান অধিকার ও সুযোগ সুবিধা পেতনা। কন্যাজন্মকে খুব প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখা হতো না।

'অপত্যত্বে সমানেঽপি জাতায়াং দুহিতরি প্রয়ন্তে সন্তঃ।'[৬]

রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের জন্মের পর উৎসব হলেও রাজ্যশ্রীর বেলায় কোনো উৎসবই হলো না। সমাজে মহিলাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার ছিল না। চতুর্থ উচ্ছ্বাসে আমরা দেখতে পাই যে, রাজা প্রভাকরবর্ধন রাজ্যশ্রীর বিয়ের ব্যাপারে রানী যশোমতীর মতামত জানতে চাইলে তিনি উত্তরে বললেন যে,

'সংবর্ধনমাত্রোপযোগিন্যো ধাত্রীনির্বিশেষা ভবন্তি খলু মাতরঃ দানে তু প্রমাণমাসাং পিতরঃ[৭]

অর্থাৎ মেয়েদের মানুষ করার ব্যাপারে মায়েদের ভূমিকা ধাত্রীর মতোই, আর বিবাহরে ব্যাপারে পিতারাই সিদ্ধান্ত নেবেন।

এই উক্তিতে যশোমতীর চাপা দীর্ঘশ্বাস থাকলেও তিনি তৎকালীন সমাজের বাস্তব দিকটির প্রতিই অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিলেন। রাজা প্রভাকরবর্ধন রানীর ঐ উত্তর পাবার পরই, মৌখরীরাজ গ্রহবর্মার সঙ্গে তার একমাত্র কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়েছিলেন। ছোট ছোট অনেক রাজ্যে বিভক্ত ছিল দেশ। সেরকম শ্রীকণ্ঠজনপদে স্থানীশ্বর নামে একটি প্রদেশ ছিল। যে স্থানটি ছিল ভুবনের মূর্তিমান নবযৌবন। এই স্থানীশ্বর ছিল মুনিদের কাছে তপোবন, বারাঙ্গনাদের কাছে কামায়তন, নটদের কাছে সঙ্গীতশালা, শত্রুদের কাছে যমপুরী, প্রার্থীদের কাছে সকল মনোবাঞ্ছাপূরণকারী চিন্তা মণিভূমি, শস্ত্রজীবীদের কাছে বীরক্ষেত্র, ছাত্রদের কাছে গুরুকুল, গায়কদের কাছে গন্ধর্বনগর, বিজ্ঞানীদের অর্থাৎ চৌষট্টিকলবিৎ শিল্পীদের কাছে দেবশিল্প, যা বিশ্বকর্মার গৃহরূপে বিবেচিত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

এখানেই পুণ্ডরীকনেত্র বিষ্ণুর নাভিকমলের মতো কমলনেত্র পুষ্পভূতি থেকে এক রাজংশের উদ্ভব হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা যেমন স্বেচ্ছামতো নাভিপদ্মের কোষে অধিষ্ঠান করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা তেমনি এই রাজবংশ থেকে স্বেচ্ছামতো ধন লাভ করতেন।
এই বংশেই অনেক রাজার জন্ম হয়েছিল। তাঁদের মধ্যেই একজন ছিলেন 'রাজাধিরাজ' প্রভাকরবর্ধন।

> "তেষু চৈবমুৎপদ্যমানেষু ক্রমেণোদপাদি হূণ হরিণকেসরী সিন্ধুরাজজ্বরো গুর্জর প্রজাগরো গান্ধারোধিপগন্ধদ্বিপকূটপাকলোলাটপাটবপাটচ্চরো মালবলক্ষ্মীলতাপরশুঃ প্রতাপশীল ইতি প্রথিতপরনামা প্রভাকরবর্ধনো নাম রাজাধিরাজ। যো রাজ্যাঙ্গসঙ্গী ন্যাভিষিচমান এব মলানীবমুমোচধনানি। যঃ পরকীয়েনাপি কাতরবল্লভেন রণমুখেতৃণেনেব ধৃতেনলজ্জত জীবিতেন"।[৮]

অর্থাৎ রাজা প্রভাকরবর্ধন ছিলেন হূন হরিণদের সিংহ, সিন্ধুরাজের জ্বর, গুর্জর রাজের নিদ্রানাশক। গান্ধার দেশের অধিপতি ছিলেন গন্ধগজ স্বরূপ প্রভাকরবর্ধন, ছিলেন সেই গন্ধগজেরও কূটপালনামক রোগবিশেষ যে রোগে হাতিরও নিস্তার নেই। তিনি আরও ছিলেন লাটদেশের রাজার দক্ষতাহরণকারী এবং মালব রাজের রাজ্যশ্রীর কুঠার স্বরূপ। স্নান করার সময় কোনো ব্যক্তি যেমন তার অঙ্গে লেগে থাকা ময়লা ধুয়ে ফেলে, তেমনি রাজা প্রভাকরবর্ধন রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যঙ্গে লগ্ন ধনসম্পদ (ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদের জন্য) উৎসর্গ করেছিলেন।
এছাড়াও তৎকালীন সমাজে রাজাদের মধ্যে অহরহ দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। যেমন দেখা যায় যে, প্রভাকরবর্ধন হূন-গুর্জর রাজাদের পুরোপুরি দমন করতে পারেননি।

পরবর্তীতে রাজ্যবর্ধনকে বহু সৈন্য সামন্ত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন হূনদের দমন করার জন্য যা পঞ্চম উচ্ছ্বাসে আমরা দেখতে পাই। এছাড়াও মালবরাজ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু সংবাদ শুনে রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মাকে হত্যা করে এবং রাজ্যশ্রীকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। পরবর্তীতে রাজ্যবর্ধন মালবরাজকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করলেও নিজে প্রাণ হারায় গৌড়েশ্বরের হাতে যা আমরা ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে দেখতে পাই। পরবর্তীতে অবশ্য হর্ষবর্ধন বিশ্বজয়ে বেরিয়ে উত্তর ভারতের একটি বৃহৎ অংশকে একতাবদ্ধ করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

Dhaka University Institutional Repository

## ধর্মীয় অবস্থা

ধর্ম ও উপাসনার ব্যাপারে সমাজের সকলেই উদার মনোভাব পোষণ করতেন। বিভিন্ন দেবতার উপাসকও লক্ষ করা যায়। যাদের মধ্যে কেউ ছিল শিবের আবার কেউ বা ছিল সূর্যের উপাসক। বিভিন্ন ধর্মের পাশাপাশি সহাবস্থানও লক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পাশাপাশি সমাজে জৈন ও বৌদ্ধধর্মও ছিল। কেউ বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করত। যেমনটি করেছিলেন দিবাকর মিত্র যিনি গ্রহবর্মার সুহৃদ ছিলেন, প্রথমে ছিলেন ব্রাহ্মণ পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর শিষ্যেরাও ছিল নানা দেশের এবং নানা ধর্মমতের।

## শিক্ষা ও সংস্কৃতি

ব্রাহ্মণগৃহে সর্বদা অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের দ্বারা মুখর থাকত। রাজ্যশ্রীর অন্বেষণে এই দিবাকর মিত্রের কাছে এসেছিল হর্ষ যা আমরা অষ্টম উচ্ছ্বাসে দেখতে পাই। দিবাকর মিত্র যিনি পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ধর্ম ও কর্তব্যের মধ্যে কর্তব্যের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন, আর তাই তিনি রাজ্যশ্রীকে বলেছিলেন "যদি ভ্রাতেতি যদি জ্যেষ্ঠ ইতি যদি বৎসল ইতি যদি গুণবানিতি যদি রাজ্যেতি সর্বথা স্তাতবামস্য নিয়োগে"[৯]। নানা রকমের শিক্ষার্থীর সমাবেশও আমরা দেখতে পাই এই দিবাকর মিত্রের আশ্রমে । যাদের মধ্যে ছিল মস্করী, শ্বেতাম্বরী, পাণ্ডুরভিক্ষু, ভাগবত বর্মী, কেশলুঞ্চন, কাপিল, লোকায়তিক, কনাদ, ঔপনিষদিক, ঐশ্বর কারণিক, পূর্বমীমাংসক, শব্দস্ফোটবাদী, পাঞ্চরাত্রিক আরও নানা রকমের।

উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকেই আমরা তৎকালীন সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সংস্কৃতির এক চমৎপ্রদ বর্ণনা দেখতে পাই যা বাণভট্ট একজন জুহুরীর মতোই প্রত্যক্ষ করে বর্ণনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

# পঞ্চম অধ্যায়

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. *হর্ষচরিত*, বাণভট্ট: (১৮শ খণ্ড), সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, প্রধান উপদেষ্টা: ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রকাশক: নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ: ২২ জুন ১৯৮৭, পৃ. ২৪৮

২. প্রাগুক্ত পৃ. ২৬২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৮. *হর্ষচরিত*, বাণভট্ট: হর্ষচরিত, (১৮শ খণ্ড), সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, প্রধান উপদেষ্টা: ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রকাশক: নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ: ২২ জুন ১৯৮৭, পৃ. ২৬২

৯. পূর্বোক্ত ঐ পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## উপসংহার

সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র বাণভট্ট। যার অনবদ্য সৃষ্টিকর্ম হলো 'হর্ষচরিত' নামক গদ্যকাব্য যার ভাব, ভাষা, শব্দ, অর্থ, বর্ণনা, সৌন্দর্য অধিকতর অভিনব ও উন্নত। তাই এ কাব্যপাঠে পাঠক বিমুগ্ধ হন। বাণের কাব্যকলার সকল বৈশিষ্ট্য যেন তাঁর শৈলীতেই নিহিত। আর 'হর্ষচরিত' হলো তাঁর সেই শৈলীপ্রধান রচনা। বহির্জগতের বর্ণনায় যেমন বাণ উৎকলিকাপ্রিয়, তেমনি অন্তর্জগতের প্রতিটি চিত্রণেও তিনি চূর্ণক বা আবিদ্ধের সরলতায় আকৃষ্ট।

নবো২র্থঃ জাতির গ্রাম্যা শ্লেষঃ স্পষ্টঃ স্ফুটো বসঃ।
বিকটাক্ষরবন্ধশ্চ কৃৎস্নমেকত্র দুর্লভম্॥[১]

সকল দুর্লভকেই তিনি সর্বদা একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন এবং ভবিষৎ রচয়িতাদের কাছে একটি আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছেন। তিনিই তো বাণ যিনি প্রতিবাদমুখরও হয়েছেনও কখনও কখনও। হর্ষবর্ধন তাকে 'মহানয়ং ভুজঙ্গ' বললে সাথে সাথেই তিনি তার প্রতিবাদ করেছিলেন। এই প্রখর আত্মসম্মানবোধ তার চরিত্রকে আরও মহিমান্বিত করেছিল। হর্ষবর্ধনের রাজসভার সভাকবি ছিলেন বলেই হর্ষকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। আর তাইতো 'হর্ষচরিতে'র বর্ণনায় বাণভট্ট প্রত্যক্ষ ঘটনাবলির এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়েছেন যা আমরা খুব কম সাহিত্যকর্মেই পরিলক্ষিত করে থাকি। আটটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত এই 'হর্ষচরিত'। প্রতিটি উচ্ছ্বাসেই তাঁর রচনা শৈলীর এক অনন্য সাক্ষর তিনি রেখেছেন। প্রথম আড়াই উচ্ছ্বাসে তার নিজের কথা থাকলেও পরবর্তীতে তিনি রাজদরবার থেকে ফিরে এসে ভাইদের অনুরোধে 'হর্ষচরিত' শোনানো আরম্ভ করলেও স্বভাবসুলভ বিনম্রতায় এ কথা বলতে ভোলেননি যে সম্পূর্ণ চরিত শোনাবার ক্ষমতা তার নেই ,বরং সেই অবদাত চরিতের অংশমাত্র তিনি বর্ণনা করবেন একথা বলে শুরু করেছিলেন।

বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' কাব্যে ইতিহাস ও সমাজচিত্র অভিসন্দর্ভটিতে ইতিহাসের ঘটনাবহুল বর্ণনা যেমন হুন, গুর্জর রাজাদের কর্তৃক বারংবার স্থানীশ্বর আক্রমণের চিত্র ফুটে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাকরবর্ধন তাদের পরাজিত করলেও পরবর্তীতে রাজ্যবর্ধনকেও প্রভাকরবর্ধন পাঠিয়ে ছিলেন হুন ও গুর্জর রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে। আরও দেখতে পাই মালবরাজ কর্তৃক রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের একমাত্র ভগিনী রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মার মৃত্যু এবং পরবর্তীতে মালবরাজ পরাস্ত হলেও গৌড়েশ্বরের হাতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু। এই গৌড়েশ্বরই যে শশাঙ্ক সে কথা আমরা পরবর্তীতে জানতে পারলেও বাণভট্ট সরাসরি তার নামোচ্চারণ করেন নি। আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে, বীর ও ভয়ানক রসের বিকাশ কাহিনী লিখতে গিয়ে বাণভট্ট শশাঙ্কের নামোচ্চারণ করেননি। আর এই বর্ণনার মধ্যে তৎকালীন ঘটনাবহুল ইতিহাসের এক অনবদ্য চিত্রই আমাদের তৎকালীন ইতিহাস সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে, যার ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম।

তৎকালীন সমাজের যে বর্ণনা পাই তাতে দেখা যায় যে, তৎকালীন সমাজ ছিল সামাজিক চেতনাঋদ্ধ। সমাজে যেমন ছিল শ্রী ও সমৃদ্ধির চিত্র, তেমনি সহমরণ প্রথা, নারীর অধিকার বঞ্চিত হওয়া, দাসবৃত্তি, নানা পেশার মানুষের সমাবেশ, বিবিধ সংস্কার, চতুরাশ্রম ও চাতুর্বর্ণ্য প্রথা, ধর্ম ও উপাসনার ব্যাপারে আশ্চর্য ঔদার্যতা, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মের সহাবস্থান, যা তখনকার সমাজ ব্যবস্থার জন্য ছিল সত্যিই দুর্লভ ব্যাপার। তিনিই তো বাণভট্ট যিনি ধারাবাহিকভাবে একদিকে তুলে ধরেছেন ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনাবহুল তথ্য তেমনি অপরদিকে তৎকালীন সমাজের প্রকৃত ঘটনাগুলোকেও লোকচক্ষুর অন্তরালে না রেখে তুলে ধরেছেন সর্বসম্মুখে। যেখানে সমৃদ্ধি আর অব্যাহত উন্নয়নের ধারা যেমন ছিল তেমনি সমাজের কুপ্রথাগুলোর বর্ণনাও ছিল। প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরতে তিনি সব সময়ই বেগবান ছিলেন। তাই বাণভট্টের‘হর্ষচরিত’ কাব্যে ইতিহাস ও সমাজচিত্র-এর অপূর্ব বর্ণনা এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল রূপেই পরিগণিত, যা ইতিহাসের একটি আকরগ্রন্থ হিসেবে কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে চিরকাল।

Dhaka University Institutional Repository

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. *হর্ষচরিত*, বাণভট্ট: (১৮শ খণ্ড), সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, প্রধান উপদেষ্টা: ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রকাশক: নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ: ২২ জুন ১৯৮৭, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

# গ্রন্থপঞ্জি

(১) *Harashacharita* of Banabhatta Edited With an Introduction and Notes by Mahamahopadhyaya P.V. Kane, Motilal Banarshidass Indological Publishers and Book Sellers, First Edition Bombay 1918, Reprint: Delhi 1965, 1973

(২) *'হর্ষচরিত'*, বাণভট্ট: (১৮শ খণ্ড), সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, প্রধান উপদেষ্টা, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রকাশক: নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ: ২২ জুন, ১৯৮৭

(৩) *'হর্ষচরিত'* বাণভট্ট: অনুবাদ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৮৫: জুলাই ১৯৭৮, দ্বিতীয় সংস্করণ আষাঢ় ১৩৯৩: জুলাই ১৯৮৬, প্রকাশক ডি. মেহরা, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট: কলিকাতা ৭০০০৭৩

(৪) *সাহিত্যদর্পণ:* বিশ্বনাথ কবিরাজ, বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনা, অধ্যাপক শ্রী বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রী শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা, ৭০০০৬ ও দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৩৮৬

(৫) *Harshacharita* of Banabhatta: Edited by P.L Vaidya, J.S.N Chakravarthy and P.V Kane, Published by Poona Oriental Book Agency, First Edition-1939

(৬) *Harshacharita* of Banabhatta: Translated With Occassional Omissions by CM. Ridding, Firts Indian Edition-New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, First Edition-1974

(৭) *Harshacharita* of Banabhatta: Translated by E.B Cowell and F.W Thomas, Printed and Publish Under The Patronage of The Royal Asiastic Society, First Edition-1897

Dhaka University Institutional Repository

(৮) *A History of Sanskrit Literature,* A. Barriedale Keith, Motilal Banaisidass Phblishers Private Limited, First Indian Edition Delhi 1993, Reprint: Delhi: 1996, 2001

(৯) *Harshacharita* of Banabhatta: A Literary Study, Edited by Neeta Sharma and Munshiram Manoharlal, Published by Poona Oriental Book Agency, First Edition: Delhi 1968

(১০) *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রকাশক: শ্রী সুরজিত চন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, লেলিন সরণী কলকাতা-৭০০০১৩, দশম সংস্করণ: জুলাই ২০১০

(১১) *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ), গোপাল চন্দ্র সিন্‌হা, প্রকাশক: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৯৭

(১২) *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস,* সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক: পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কয়ার, কলকাতা-৭০০০১৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল-১৯৮৫ পুনর্মূদ্রন: আগষ্ট ২০১০

(১৩) *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ব্রাত্যজনের চোখে,* উমা চক্রবর্তী, অনুবাদ: অম্লান চক্রবর্তী। প্রকাশক: সেতু প্রকামনী ১২/এ, শংকর ঘোষ লেন, কলকাতা-৭০০০১৩, প্রথম সংস্করন: জুলাই-২০১১

(১৪) *উপমহাদেশের আইন ও শাসনের ইতিহাস,* (১ম খণ্ড: প্রাচীন কাল থেকে সুলতানী আমল), আব্দুস সালাম মামুন, প্রকাশক: সৈয়দ জাকির হোসাইন, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন ২৯, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

(১৫) *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* ড. আব্দুল মোমিন চৌধুরী, প্রকাশক: মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৯, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০২, ঢাকা

(১৬) *সিদ্ধান্ত কৌমুদীর আলোকে কৃৎ প্রত্যয় বিচার,* ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য, প্রকাশক: গোলাম মঈন উদ্দিন, পরিচালক পাঠ্যপুস্তক বিভাগ বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: অগ্রহায়ন ১৪০২, ডিসেম্বর ১৯৯৫ ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

(১৭) *বাঙালীর ইতিহাসে (*আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ:১৩৫৬, পুনর্মুদ্রন: ১৩৫৯ কলিকাতা-৭০০৭৩

(১৮) *Harshacharit* of Banabhatta: Edited by p.v Kane, Published by Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, First Edition: Bombay 1918, Reprint: Delhi 1965, 1973

(১৯) *ভারতের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ হইতে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)*, অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক: মৌলিক লাইব্রেরি, ১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০৭৩, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারী ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন, ২০০০

(২০) *বিশ্বসভ্যতা (প্রাচীন)*, এ.কে এম শাহানাওয়াজ, প্রকাশক: প্রতীক প্রকাশক, প্রথম সংস্করণ: ১৯৯৩, ঢাকা

(২১) *বঙ্গ, বাঙলা ও ভারত*, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ: ২০০১, কলিকাতা

(২২) *ইতিহাসের দর্শন*, মমতাজুর রহমান তরফদার, প্রকাশক: বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ:১৯৮১

(২৩) *বাংলার ইতিহাস*, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রকাশক: অধুনা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: ২০০৩, ঢাকা

(২৪) *বাংলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্ম সাধনা*, শ্রী শশীভূষণ দাস গুপ্ত, প্রকাশ: অ্যাডর্ন পাবলিশার্স। প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬, কলিকাতা

(২৫) *ভারতের ইতিহাসের কথা*, ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, প্রকাশক: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩, কলিকাতা

(২৬) *ইতিহাসে বাঙ্গালী*, রমাপ্রসাদ চন্দ্র, প্রকাশক: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮১, কলিকাতা

(২৭) *সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ* (১ম খণ্ড), ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রকাশক: সাহিত্যলোক, প্রকাশ: ১৩৮৯, কলিকাতা

(২৮) *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, মমতাজুর রহমান তরফদার, প্রকাশক: বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮১, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

(২৯) *History and Culture Bengal*, Dr, AK, Sur, Published by Best Books, First Edition:1992, Calcutta

(৩০) *দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস প্রাচীন কাল থেকে ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত*, মো: রমজান আলী, প্রকাশক: আকন্দ প্রকাশনী, বগুড়া, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮১

(৩১) *বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ), সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, প্রকাশক: প্যাপিরাস পাবলিশার্স প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬, ঢাকা

(৩২) *প্রত্নতত্ত্ব উদ্ভব ও বিকাশ*, মোঃ মোশাররফ হোসেন, প্রকাশক: বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮, ঢাকা

(৩৩) *বাঙালীর ইতিহাস চর্চা* (প্রাচীন যুগ), ড.এ.কে এম আলী ও রুহুল কুদ্দুস, প্রকাশক: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশ: ২০০৬, ঢাকা

(৩৪) *বাংলার প্রাচীন ইতিহাস*, শ্রী অসীত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক: মর্ডান বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮২, কলিকাতা

(৩৫) *দ্য মিউজিয়াম*, ফিরোজ মাহমুদ ও হাবিবুর রহমান, প্রকাশক: বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৫, ঢাকা

(৩৬) *ভারত শিল্প*, নির্মল চন্দ্র ঘোষ, প্রকাশক: কে. এল. এম ফার্মা, প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৩, কলিকাতা

(৩৭) *হরপ্রসাদ রচনাবলী (৩য় খণ্ড)*, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক: ইস্টার্ন ট্রেডিং কোং লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫২, কলিকাতা

(৩৮) *হাজার বছরের পুরানো বাংলায় বৌদ্ধ গান ও দোহা*, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রকাশক: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পুণর্মুদ্রন: ১৯৫৯, কলিকাতা

(৩৯) *শিল্প ভারত ও বহি:ভারত*, মণীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত, প্রকাশক: বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, প্রথম প্রকাশ:১৯৭৫, কলিকাতা

(৪০) *ভারত শিল্পের কথা*, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, প্রকাশক: সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ: ১৩৮৯, কলিকাতা

(৪১) *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৭, কলিকাতা

Dhaka University Institutional Repository

(৪২) *গৌড়বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি* (১ম ভাগ), ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ:২০০৩, কলিকাতা

(৪৩) *ভারতের ইতিহাস পরিক্রমা*, প্রতাতাংশু মাহতি, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ১৯৯৪, কলিকাতা

(৪৪) *বৃহৎ বঙ্গ* (১ম ও ২য় খণ্ড), দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রকাশক: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশকাল: ১৩৪১, কলিকাতা

(৪৫) *পৌরাণিক অভিধান*, অমল কুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রকাশক, ফার্মা কে এম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৯, কলিকাতা

(৪৬) *বৌদ্ধগান ও দোহা* (২য় সংস্করণ), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রকাশক: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ:১৯৫১, কলিকাতা

(৪৭) *Dynastic History of Bengal,* A.M Chowdhury, Published by Best Books First Edition: 1967, Dhaka

(৪৮) *History of Bengal,* Jadunath Sarker (ed), (Vol. I,II), Published by Dhaka University, First Edition: 1948, Dhaka.

(৪৯) *Ancient Bangladesh,* D.K. Chakrabarti, Published by University Press Limited (UPL), First Edition: 1992, Reprint: 2003, Dhaka

(৫০) *Inscription of Bengal*, Dr. Shamsul Din Ahmed, Published by Varendra Research Museum, First edition: 1960, Rajshahi

(৫১) *The Political History of Bengal,* Dr. Bani Roy Chowdhuri, Published by Sanskrit Pustak Bhandar, First Edition: 1990, Clacutta

(৫২) *Travels of Hiouen Thsang*, Samuel Beal, Translated Vol-IV, First Edition: 1931, Calcutta

(৫৩) *A History of India Literature (Vol- II)*, Max Muller, Willams and Norgate, University of Calcutta, First Edition 1980, London

Dhaka University Institutional Repository

(৫৪) *Encyclopaedia of Religions*, M.A Canney, First Edition: 1973, Delhi, India

(৫৫) *Annual Report of the Archaeological Survey of India*, M.H Kramrish, First Edition: 1930-34, Reprint: 1936, Delhi.

(৫৬) *Taxila, (Vol-3),* J.H. Marshal, First Edition: 1951, Cambridge, London

(৫৭) *5000 years of Arts and Crafts in India and Pakistan*, Swarup Shanti, Published by Best Publishers, First Edition: 1968, Bombay

(৫৮) *The History of Bengal (Vol-I),* Dr. Ranesh Chandra Majumder, First Editon: 1963, Calcutta

(৫৯) *The Early History of India, Published by Oxford University,* V.A Smirt, First Edition: 1924, Oxford

(৬০) *An Advance History of India,* R.C Majumder and Others, First Edition: 1928, London

(৬১) *Ancient India,* D.K barua, Published by Indian Publication, First Edition: 1969, Calcutta

(৬২) *A History of Indian Philosophy (Vol.I-V),* S.N Das Gupta, Published by Cambridge University Press.First Edition: 1951, Cambridge, London

(৬৩) *Encyclopaedia of Religion and Ethics (Ed),* J. Hasting, (Vol-IX), First Edition-1917, London

(৬৪) *Editorian Chief, Encyclopaedia INDICA, (India, Nepal, Barma, Pakistan, Bangladesh),* S.S SHASHI, Published by Anmol Publications Pvt. Ltd, First Edition; 1966, New Delhi, India

Dhaka University Institutional Repository

(৬৫) *Hinduism and Buddhism,* C. Elliot, Published by Edward Arnold and co. Ltd, First Edition: 1921 London

(৬৬) *Theravada Sangha,* R.B Barua, Published by Asiatic society of Bangladesh, First Edition: 1978, Dhaka

(৬৭) *Pre-Aryan and Pre Dravidian,* Dr, Praboth Chandra Bagchi, Published by Asian Educational Services, First Edition: 1993, India

(৬৮) *A Cutural Center of Early Bengal,* B.M Mourison, Published by Eduward Arnold and co.Ltd, First Edition:1974, London

(৬৯) *Hinduism of India*, Sir Charls Eliot, Published by Adron Publishers Pvt Ltd, First Edition: 1988, Delhi, India

(৭০) *Translated by James Legge, A Records of the Ancient Indian Calture,* Published by Munshiram Fa-Hien, Publishers Pvt. Ltd., First Edition: 1998, Delhi, India

Dhaka University Institutional Repository

# মানচিত্র

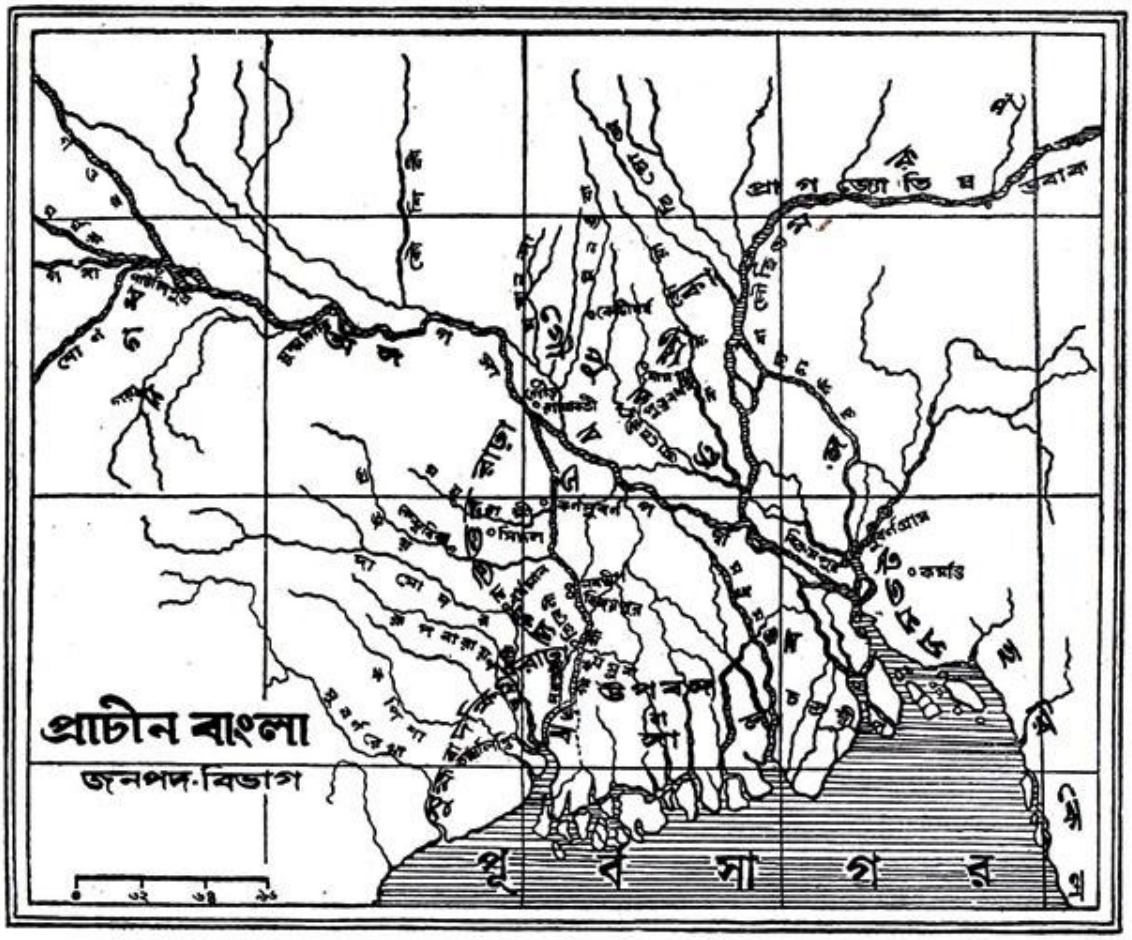


## ১নং মানচিত্র

## প্রাচীন বাঙলার জনপদ বিভাগ (ষষ্ঠ-সপ্তম শতক)

**মানচিত্র বিবরণী:** ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের প্রাচীন বাঙলার জনপদের বর্ণনা এই মানচিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে যা তৎকালীন সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল রূপে পরিগণিত।[১]

Dhaka University Institutional Repository

# মানচিত্র

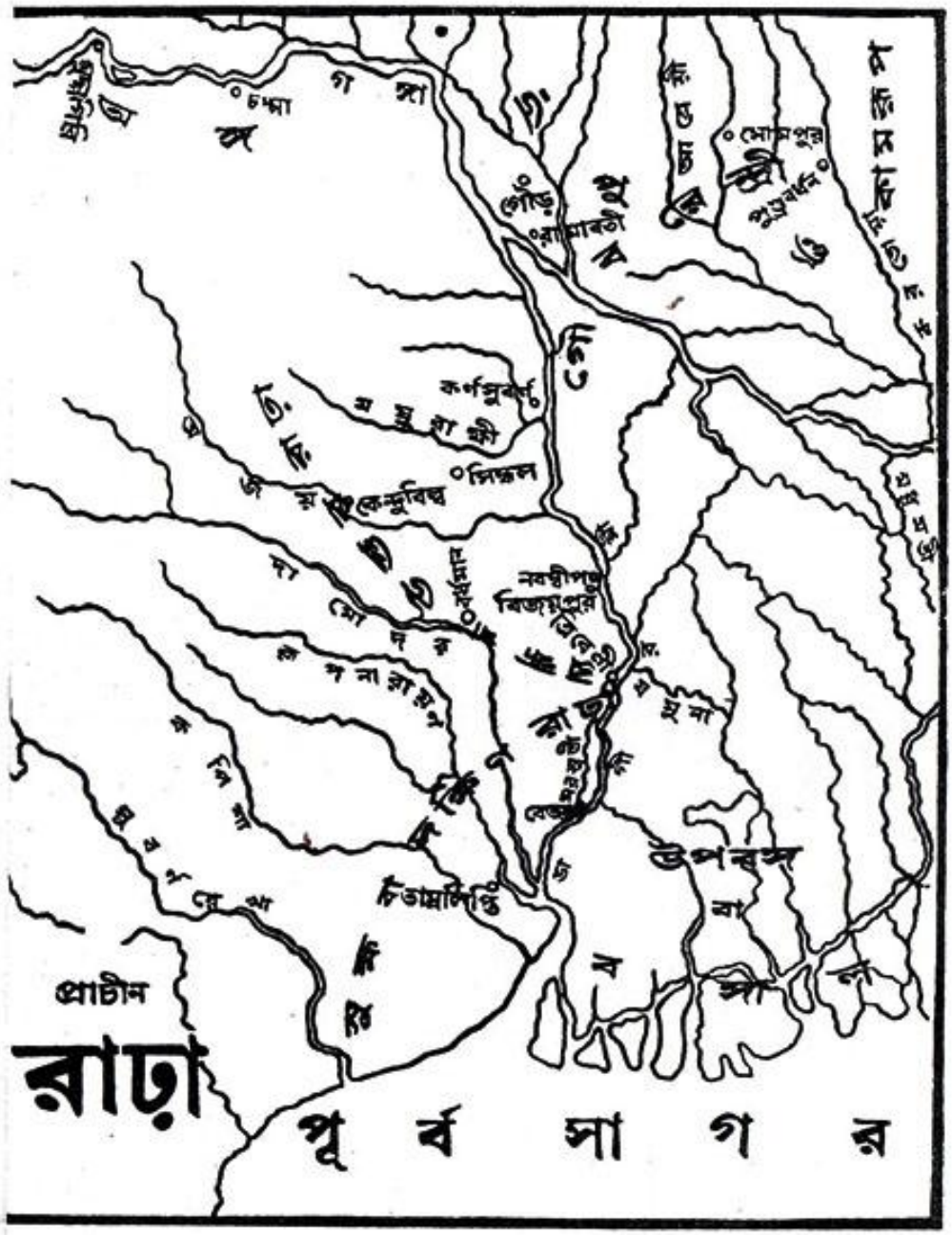


২নং মানচিত্র

## প্রাচীন রাঢ়া দেশ

**মানচিত্র বিবরণী:** ষষ্ঠ-সপ্তম ও অষ্টম শতকের প্রাচীন বাংলা ও জনপদের গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা এর মধ্যে ফুটে উঠেছে।[২]

Dhaka University Institutional Repository

# মানচিত্র-বিবরণী

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. *ভারতের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত), অতুল চন্দ্র রায় ও প্রনবকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন, ২০০০, প্রকাশক: মৌলিক লাইব্রেরি, ১৮বি. শ্যামাচরন দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৭৯৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯৮

Dhaka University Institutional Repository

# Autograph of Harsha from the Banskhera Plate

## হর্ষবর্ধনের হস্তলিপি

১

दूतकोऽत्र महाप्रमातार-महासामन्त-श्रीस्कन्दगुप्तः महाक्षपटलाधिकरणाधिकृत-सामन्तमहाराजेश्वरगुप्तसमादेशाच्चोत्कीर्णं गर्जरेण ( गुर्जरेण? ) । संवत् २० ५ मार्गशीर्ष वदि ६. The Banskhera plate of Harsha (see E. I. vol. IV p. 208 ff ) contains the same details as above, except the following:— The charter is issued from Vardhamānakoṭí; the donees are Bālachandra, a Rigvedin of the Bharadvājagotra and Bhadra-svāmin, a Sāmavedin; the village granted is Markaṭasāgara, which was in the *Bhukti* of Ahichchhatrā and in the western *Pathaka* of the Angadîya *Vishaya*; the keeper of the records is one Bhāna or Bhānu and the concluding words are 'उत्कीर्ण-मीश्वरेणेदमिति संवत् २० २ कार्ति वदि १ स्वहस्तो मम महाराजाधिराजश्रीहर्षस्य ।'.

स्व ह स्तो म म म हा रा जा धि रा ज श्री ह र्ष स्य

# হর্ষবর্ধনের হস্তলিপি

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

1. *The Harshacarita* of Banabhatta, Edited With an Introduction and Notes by Mahamahopadhyaya P.V Kane, Published by Motilal Banarsidass Indological Publishers & Booksellers, First Edition: Bombay, 1918, Reprint: Delhi 1965, 1973, P. xxix

Dhaka University Institutional Repository

# প্রাচীন যুগে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

## চিত্র : তক্ষণ শিল্প নিদর্শন

চিত্র ১

চিত্র ২

## চিত্র বিবরণী: তক্ষণ শিল্প নিদর্শন

**চিত্র: ১** সপ্তাশ্ববাহিত, অরুণসারথি, রথোপরি দণ্ডায়মান, পদ্মাধৃতহস্ত সূর্য। কাশীপুর, ২৪ পরগনা। ধূসর বেলে পাথর। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক। সৌজন্য: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশুতোষ সংগ্রহশালা।

**চিত্র: ২** মুণ্ডবিহীন, পদবিহীন, দণ্ডায়মান নগ্ন, জৈন তীর্থঙ্কর প্রতিমা। চন্দ্রকেতুগড়। ধূসর বেলে পাথর। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক। সৌজন্য: শ্রী গৌরীশংকর দে।[১]

Dhaka University Institutional Repository

# চিত্র : তক্ষণ শিল্প-নিদর্শন

চিত্র ৩

চিত্র ৪

চিত্র ৫

Dhaka University Institutional Repository

# চিত্র বিবরণী: তক্ষণ শিল্প নিদর্শন

**চিত্র: ৩** দেবতা বিষ্ণুর মুকুটশোভিত শির ও মুখাবয়ব। উছাসন, বর্ধমান। ধূসরকৃষ্ণ কঠিন বেলে পাথর। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক। সৌজন্য: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নবিভাগ সংগ্রহশালা।

**চিত্র: ৪** একটি সুদর্শন দেবমূর্তি, সম্ভবত সূর্যবিগ্রহের পাশ্ববর্তী মূর্তি দণ্ডী। ধূসরকৃষ্ণ কঠিন বেলে পাথর। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক। সৌজন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নবিভাগ, সংগ্রহশালা।

**চিত্র: ৫** শাক্যমুনি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ দৃশ্য। ২৪পরগনা। ধূসরকৃষ্ণ কঠিন বেলে পাথর। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক। সৌজন্য: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশুতোষ সংগ্রহশালা।[২]

Dhaka University Institutional Repository

# চিত্র : ধাতব শিল্প নিদর্শন

চিত্র ৬

চিত্র ৭

চিত্র ৮

চিত্র ৯

Dhaka University Institutional Repository

# চিত্র বিবরণী: ধাতব শিল্প নিদর্শন

**চিত্র: ৬** ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধদেব। ঝেওয়ারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। অষ্টধাতু। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক সৌজন্য: কলকাতা মিউজিয়াম, কলকাতা।

**চিত্র: ৭** অভয়মুদ্রালাঞ্ছিত দণ্ডায়মান বুদ্ধদেব। ঝেওয়ারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। অষ্টধাতু। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক। সৌজন্য: কলকাতা মিউজিয়াম, কলকাতা।

**চিত্র: ৮** সুদেবী ও ভূদেবীসহ দণ্ডায়মান বিষ্ণু। অষ্টধাতু। রংপুর, বাংলাদেশ। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক সৌজন্য: কলকাতা মিউজিয়াম, কলকাতা।

**চিত্র: ৯** শ্রী ও সরস্বতী সহ দণ্ডায়মান বিষ্ণু। অষ্টধাতু। রংপুর, বাংলাদেশ। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক । সৌজন্য: কলকাতা মিউজিয়াম, কলকাতা।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

# চিত্র : মৃৎশিল্প নিদর্শন

চিত্র ১০

চিত্র ১১

চিত্র ১২

চিত্র ১৩

Dhaka University Institutional Repository

# চিত্র বিবরণী: মৃৎশিল্প নিদর্শন

**চিত্র: ১০** মুকুট-পরিহিতা একটি নারীর মুখ। তমলুক পোড়ামাটির ফলকের ভগ্নাবশেষ। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক। সৌজন্য: তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা। তমলুক।

**চিত্র: ১১** সমপদস্থান ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান একটি যক্ষিণী বা অপ্সরা প্রতিমা। চন্দ্রকেতুগড়। পোড়ামাটির ফলকের ভগ্নাবশেষ। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক। সৌজন্য: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নবিভাগ সংগ্রহশালা।

**চিত্র: ১২** পাশ্চাত্য পোষাক পরিহিতা দণ্ডায়মান নারীমূর্তি। চন্দ্রকেতুগড়। পেড়ামাটির ফলকের ভগ্নাবশেষ। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক। বিদেশী পরিধেয় এবং পরিধানের রীতি লক্ষণীয়। সৌজন্য: আমেরিকান ইনস্টিট্যুট অফ ইন্ডিয়ান স্টাডিজ রামনগর, বারাণসী।

**চিত্র: ১৩** একটি ব্যক্তিগত মুখাবয়বের বিশেষ একটি মুহূর্তের বাস্তবানুকৃতি (portraiture)। তমলুক। পোড়ামাটির ফলকের ভগ্নাবশেষ। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক। সৌজন্য: তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা। তমলুক।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

# চিত্র বিবরণী

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. নীহাররঞ্জন রায় *বাঙালির ইতিহাস* (আদিপর্ব), প্রকাশক: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ:

১৩৫৬, পুনর্মুদ্রণ: ১৯৫৯, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ: ৭৫৮-৫৯

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬২-৬৩

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৮-৭৯

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪২-৪৩